হিমালয়ের তিন তীর্থ

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬৭

প্রচ্ছদপট :
অঙ্কন—শ্রীঅজিত গুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে
প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

যার আকস্মিক অকাল-মৃত্যুতে আমাদের জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছিল, এবং তার ফলে মানসিক শান্তির অন্বেষণে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছি গত বিশ বৎসর,—আমাদের সেই পরম প্রিয় জামাতা ৺পশুপতি মুখোপাধ্যায়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম এই গ্রন্থ।

সুভাষনগর
মেদিনীপুর

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রস্তাবনা

অমরনাথ, যাঁর অপর নাম মরণ-নাথ। বললেন পুরীধামের সাধুমা। দুবার গিয়েছেন তিনি পদব্রজে অমরনাথ দর্শনে। তিনি বললেন আমার সহ-ধর্মিণীকে,—যাও, দেখে এসো। মনে খুব জোর রাখবে, বিশ্বাস রেখে সাহস করে এগিয়ে যাবে। সকলে পারে না। শ্রীপঞ্চমীর ছুটি উপলক্ষ করে চার বছর পরে গিয়েছিলাম পুরীধাম। সাধুমার বয়স প্রায় নব্বই। নুলিয়া-শাহীতে গোপালধামে থাকেন। বললেন মরণ-নাথ, তাঁর দর্শন পেতে হলে মরণের ভয় জয় করতে হয়।

তথাস্তু। দুর্গমপথে দেবতাত্মা হিমালয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ অমরনাথ দর্শনে যাওয়া স্থির করা হল।

তুষারতীর্থ অমরনাথ। সমুদ্রতট থেকে ১২,৭৩০ ফিট উঁচুতে বিরাট এক প্রাকৃতিক পর্বত-গুহার অভ্যন্তরে এক তুষার-লিঙ্গের আবির্ভাব হয় প্রতি পূর্ণিমায়। আবির্ভাব ঠিক নয়, পরিস্ফুট হয় সু-বর্ধিত আকারে। তারপর ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বিস্ময়কর ব্যাপার। পর্বত-গাত্রের মাঝামাঝি ঐ গুহা। পর্বতের পাদদেশে প্রবহমাণা অমরাবতী নদী, বহুস্থানে তুষারাবৃত। গুহার অভ্যন্তরে কোথায় কোন ফাটল দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে থাকে; সেই জল জমে গিয়ে তুষার-লিঙ্গের আকার ধারণ করে। শ্রাবণী পূর্ণিমায় সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিলেন; তাই প্রতি বৎসর শ্রাবণী পূর্ণিমায় শত শত দর্শনার্থী সেখানে উপনীত হন। শত শত নয়, সহস্র সহস্র। ঐ গুহার দৈর্ঘ্য ১৫০ ফিট, প্রস্থ বা গভীরতা ৫৫ ফিট, সামনের উচ্চতা ৪৫ ফিট। দক্ষিণমুখী গুহা। সেখানে না আছে লোকালয়, না আছে কোনও স্থায়ী পূজারী। তথাপি বিস্ময়ের বিষয় দুটি পারাবত নাকি সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। •

কহ্লন রচিত রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে একাধিকবার উল্লিখিত আছে হিম-লিঙ্গ অমরনাথের কথা। সহস্র বৎসর পূর্বে নাকি রাজা রামদেব বিষয়াসক্ত রাজা সুখদেবকে বন্দী করে অমরনাথ পর্বতের সন্নিকটে প্রবাহিতা লম্বোদরী নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে দীর্ঘ প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী একজন ভারপ্রাপ্ত মোহন্ত রৌপ্যনির্মিত দণ্ডহস্তে শ্রীনগর থেকে শোভাযাত্রা

সহ অমরনাথ গুহা অভিমুখে পদব্রজে নির্গত হন। সাধু-সন্ন্যাসীই হোন বা গৃহী তীর্থযাত্রীই হোন, সকলকেই যেতে হবে দণ্ডধারীর পশ্চাতে। কেউই আগে যেতে পারবেন না। এই নিয়ম চলে আসছে আবহমান কাল ধরে। ঐ দণ্ড বর্তমান সময়ে কাশ্মীর সরকারের ধর্মার্থ বিভাগের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত।

ভৃঙ্গীশ সংহিতায় নাকি লিখিত আছে যে মহর্ষি কশ্যপ জলমধ্য থেকে কাশ্মীর-মণ্ডল উদ্ধার করেন, আর নাগরাজ তক্ষক নগর ও বসতি সংস্থাপন করেন। ভৃঙ্গীশ ঋষি হিমালয় পরিব্রাজন করতে করতে অমরনাথ গুহায় উপনীত হন। তিনি প্রত্যাবর্তন করে অমরনাথ গুহা ও সেখানে যাতায়াতের পথের কথা মনুষ্যলোকে প্রচার করেন। দেবলোকের পরিচয় পায় মানুষ। কিন্তু শুম্ভ-নিশুম্ভ, মধুকৈটভ, মহিষাসুর থেকে আরম্ভ করে সাম্প্রতিক কালের পাকিস্তান ও লালচীনের দানবীয় রণহুঙ্কার চিরদিনই দেব-বিরোধী। মনুষ্য-লোকের দেবত্ব-প্রাপ্তির পথে তারা বাধাসৃষ্টি করে আসছে। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশই দেবত্ব। সেই উন্নয়নের পথরোধ করে চিরদিনই দণ্ডায়মান থাকে দানবকুল। মহাশক্তির আরাধনা শুরু হয়; দেবী তখন প্রসন্ন হয়ে দানব নিধনে সর্বশক্তি সমন্বিতা হয়ে আবির্ভূতা হন। সার্থক হয় শ্রীশ্রীচণ্ডীর আশ্বাস-বাণী—

> "ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি
> তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরি সংক্ষয়ম্।"

স্বাভাবিক নিয়মে মাঝে মাঝে দৈত্যকুলের প্রভুত্বের যুগ আসে। সেইরূপ সাময়িক দৈত্যদের প্রভুত্বের সময় অমরনাথ-গুহার পথ বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। মানুষ বিস্মৃত হয়েছিল সেই পথের নিশানা। প্রায় দশ বৎসর পরে ভৃঙ্গীশ ঋষি পুনরায় লোকালয়ে আবির্ভূত হন এবং প্রচার করেন যে অমর-নাথ মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে তিনি তাঁর একটি প্রতীক "দণ্ড" প্রাপ্ত হয়েছেন; নাগরাজ তক্ষকের কাছে সেই দণ্ড তিনি দিয়েছেন। সেই দণ্ড ধারণ করে একজন অগ্রগামী হবেন এবং যাত্রীগণ দলবদ্ধ হয়ে তাঁকে অনুসরণ করবেন, অমরনাথ গুহা অভিমুখে। তদবধি চলে আসছে সেই প্রথা। ঐ দণ্ডকে চলতি কথায় বলা হয় "ছড়ি সাহেব"। দশনামী আখড়ার মোহন্ত নেতৃত্ব করেন ঐ দলের। তিনি যেখানেই আসন গ্রহণ করবেন সেইখানে তাঁর উভয় পার্শ্বে দুজন দণ্ডধারী রক্ষী দণ্ডায়মান থাকবেন। কাশ্মীরের শ্রীনগর থেকে যাত্রা শুরু করে ঐ দলের প্রথম বিশ্রামস্থল হ'ল পাঁ-পুর। তারপর বীজ-বিহারে;

সেখানে মন্দিরের পূজারী প্রত্যেক সাধু-মহাত্মার ভোজনের ব্যবস্থা করে দেন। স্থানীয় সাধুরাও মিলিত হয়ে সেখানে এক সাধু সম্মেলন হয়। তারপর যথাক্রমে অনন্ত-নাগ, ভবন ও আশীমুকাম এই তিন স্থানে বিশ্রাম করার পর ঐ যাত্রীদল পহলগাঁও-এ এসে পৌছায়। সেখান থেকে সাড়ে আটাশ মাইল দূরে অমরনাথ গুহা। ঐ পথে তিনটি বিশ্রাম-ঘাঁটি। প্রথম চন্দন-বাড়ি দশ মাইল দূরে অবস্থিত। উচ্চতা সমুদ্রতট থেকে ৯,৫০০ ফিট। তারপর প্রায় ৫।৬ মাইল পথ অতিক্রম করলে "বায়ু-জান"। "শেষ-নাগ" হ্রদের উর্ধ্বে। উচ্চতা ১২,৮৫০ ফিট। তৃতীয় বিশ্রামকেন্দ্র আরও প্রায় আট মাইল দূরে অবস্থিত "পঞ্চতরণী"। উচ্চতা ১২,০০০ ফিট। তারপর সাড়ে চার মাইল অতি দুর্গম পথের শেষে অমরনাথ গুহা। উচ্চতা ১২,৭৩০ ফিট।

পহলগাঁও থেকে যাত্রা শুরু হয় শুক্লা একাদশীতে। পহলগাঁও শব্দের অর্থ মেষ-পালকদের গ্রাম। লীডর নদীর তীরে পর্বতমালা বেষ্টিত অতি মনোরম এই স্থান। পরে যথাস্থানে বিস্তৃত বিবরণ দেব। এখন শুধু সংক্ষেপে যাত্রাপথের অবস্থিতির ইঙ্গিত মাত্র প্রদত্ত হ'ল। পহলগাঁও থেকে পার্বত্য পথে আরোহণ উপযোগী টাট্টু, মালপত্র বহনের কুলী ও ইদানীং ডাণ্ডী, ডুলি, চেয়ার প্রভৃতি ভাড়া পাওয়া যায়। চামড়ার জুতা অচল। ঐস্থানে ঘাসের তৈরী একরকম পাদুকা পাওয়া যায়; প্রায় সকলেই তা কিনে পরে নেন। আর দরকার হয় সূচালো লোহা-লাগানো লাঠি। বরফ ঢাকা পথে অপরিহার্য। উলের জামা, উলের টুপি, দস্তানা, মোজা (দুই জোড়া), গরম পোশাক, মাফলার, বর্ষাতি অর্থাৎ "রেন-কোট" প্রভৃতি অবশ্যই নিতে হয়। টর্চও সঙ্গে নেওয়া ভাল। হালকা খাবার, কিসমিস, বাদাম, আখরোট, মিছরী এবং জলের ফ্লাস্কও সঙ্গে থাকা দরকার। আর অমরনাথের পূজা-উপকরণ সমস্তই পহলগাঁও-এ কিনতে পাওয়া যায়। যথা, কর্পূর, কিসমিস, চিনি, কালমরিচ, বস্ত্র, নারিকেল খণ্ড। তদ্ভিন্ন যাঁর যা ইচ্ছা, রত্নদীপ, রূপা বা সোনার ত্রিশূল, সর্প, প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে যান। গুহার ভিতরে প্রস্তর-বেদীতে তিনটি বরফের মূর্তি দেখা যায়! গণেশ, শিব ও পার্বতী। মধ্যস্থলে বরফের শিবলিঙ্গই অমরনাথ। চার ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। গঠনকৌশল বর্ণনা করে বোঝানো সম্ভব নয়।

॥ যাত্রা শুরু ॥

সেই অমরনাথ দর্শনের উদ্দেশ্যে আমরা উনিশশ চৌষট্টি সালের ৩রা আগস্ট হাওড়া স্টেশন থেকে বারানসী এক্সপ্রেস ট্রেনে সংযুক্ত কুণ্ডু স্পেশালে রওনা হলাম। এবার দেখলাম ট্যুরিস্ট কোচে মেঝের পৃথক বেঞ্চের পরিবর্তে বিস্তৃত জুট-কার্পেট বিছানো রয়েছে এবং তার উপর একজনের শয়ন উপযোগী ডানলো-পিলো রবারের গদি ছখানি পাতা আছে। ছজন যাত্রীর জন্য। গাড়ির দুপাশে যে লম্বা বেঞ্চ তাতে দুজন হিসাবে চারজন এবং উপরের দুপাশের বাঙ্কে ঐ হিসাবে চারজন। এই ভাবে ট্যুরিস্ট কোচের দুটি খোপে চৌদ্দজন করে মোট আটাশ জন যেতে পারেন। তা ছাড়া মাঝে একটি কেবিন আছে। তাতেও ছজনের মত স্থান থাকে। আবার প্যাসেজেও বেঞ্চ দিয়ে রাত্রে দু-এক জনের শয়ন ব্যবস্থা করেন। সেটা না করলেই ভাল হয়।

ম্যানেজার হিসাবে দেবী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদলচন্দ্র প্রভৃতির নিপুণ কৃতিত্ব একমুখে বলে শেষ করা যায় না। সৌজন্য সমদর্শিতা ও সুমিষ্ট ব্যবহারের জন্য তাঁরা সর্বজনপ্রিয়। এবারের তীর্থযাত্রায় দেবীকে পেয়েছিলাম কাশ্মীরে শ্রীনগর পৌঁছবার পর থেকে। অন্য দল নিয়ে তাকে আসতে হয়েছিল। আর একদল নিয়ে আরও একজন ম্যানেজার এসেছিলেন, তাঁর নাম শঙ্কর ঘোষ। অতীব অমায়িক ব্যক্তি। প্রত্যেক যাত্রীর আহারাদির প্রতি তাঁর অত্যধিক দৃষ্টি কিছু কৌতুকের সৃষ্টি করেছিল। কাশ্মীরের শ্রীনগরে "মাজদা হোটেলে" ভোজনকক্ষে তিনি প্রত্যেককে একাধিকবার বিনীত প্রশ্ন করতেন।—মা, আহার হয়েছে? বাবা, আহার হয়েছে? কারো দিকে তাকিয়ে না দেখার ফলে পাত্র-পাত্রী বিচার থাকত না। কখনও কখনও পুরুষকে করতেন মাতৃ-সম্বোধন। আবার নারীকে পিতৃ-সম্বোধন।

তাই নিয়ে তরুণের দল আমোদ উপভোগ করতো। কেউ কেউ তাঁর সামনে তাঁর ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে হাত জোড় করে ও সামনে ঝুঁকে পড়ে কোন পুরুষ-বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করতো—মা, আপনার আহার হয়েছে? টালার বনমালী চ্যাটার্জি লেনের অজিত ঘোষ আর খিদিরপুরের মনসাতলা লেনের অর্জুন মল্লিক নির্দোষ আমোদপ্রিয়তায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অজিত ঘোষ কলকাতা থেকে এসেছিল আমাদেরই কামরায়। তার সঙ্গে আর

দুজন তরুণ ছিল—অরুণ দাস ও রবি ঘোষ। সকলেই খুব ভদ্রপ্রকৃতির আমোদ-প্রিয় ও পরোপকারী। অর্জুন মল্লিকের সঙ্গে দেখা হয় শ্রীনগরের হোটেলে। অন্যদলে এসেছিল। নিশাত-বাগে বৈকালে চা খাওয়ার আগে তার প্রাণ-খোলা হাসি আর এক বৃদ্ধার হাত ধরে উদ্দাম নৃত্য মনে রাখবার মত।

কলকাতা থেকে যে ট্যুরিস্ট কোচে আমরা এসেছিলাম তাতে যাঁরা আমাদের সহযাত্রী ছিলেন তাঁদের একটু পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না মনে হয়। আমাদের খোপে ছিলেন নিমু গোস্বামী লেনের তারাকুমার মুখোপাধ্যায়। শান্তস্বভাব ধর্মপ্রাণ প্রৌঢ় ভদ্রলোক। অবসর-প্রাপ্ত। নির্বিরোধী। প্রত্যূষে শয্যায় বসে মৃদুস্বরে স্তোত্রগান করতেন। বললেন, কর্ম-জীবনে কয়েকবার কীর্তনের দলের সঙ্গে মেদিনীপুরে পাটনাবাজারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু মন্দিরে দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে তিনি এসেছিলেন। অনেকেই আসতেন। প্রৌঢ়ের মধ্যে আরও ছিলেন চিনি ব্যবসায়ী সন্তোষ শ্রীমানি ও তাঁর সেবাপরায়ণ ভার্যা সরস্বতী শ্রীমানি। সন্তোষবাবুর বয়স ঢাকা ছিল কৃষ্ণবর্ণ পাতাকাটা কেশবিন্যাসে। নধরকান্তি। শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সর্বদা সর্বত্র তাঁর সজাগ দৃষ্টি।

কুণ্ডু স্পেশাল যথারীতি বেড-টি, প্রাতঃকালীন জলযোগ ও চা, মধ্যাহ্নে অন্নব্যঞ্জন, লুচি রুটি যিনি যা চান, বৈকালে চা ও জলখাবার, নৈশ-আহার সবই দিচ্ছিল। তার উপর শ্রীমানি-গৃহিণী মাঝে মাঝে তাঁর পতি-দেবতাকে হরলিকস্ তৈরী করে দিতেন; প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তাঁর হাতে-পায়ে তেল মালিশ করে দিয়েছেন। পতি-সেবার আদর্শ বলা চলে।

পতি-দেবতার শরীর কিন্তু বেশ সুস্থ ও সবল। তেল মালিশে বোধ হয় আরাম পান। তিনি যে কি রকম সৌভাগ্যবান, তার পরিচয় সবিস্তারে দিতেন। একমাত্র পুত্র। ঐশ্বর্যের অন্ত নেই। Railway Users Consultative Committeeর সদস্যের পরিচয়-পত্র একখানি তিনি সঙ্গে নিয়ে চলেছেন; সকলকে দেখাতে লাগলেন। বললেন—'অল স্টেশন্‌স্,' যে কোনও স্টেশনে তিনি ঐ কার্ড দেখিয়ে যেতে পারেন। আমাকেও দেখালেন। হাসলাম। আত্মপ্রসাদের মোহ ও আত্মপ্রচারের দুর্বলতা দেখে। শ্রীমান অজিত শ্রীমানি গৃহিণীর নামকরণ করেছিল—"চিনি-মাসীমা"।

শ্রীমানি মহাশয় শেষ পর্যন্ত কিন্তু অমরনাথ দর্শন না করেই চন্দনবাড়ি থেকে সস্ত্রীক ফিরে গিয়েছিলেন পহলগাঁও-এর হোটেলে। পহলগাঁও থেকে

কুড়ি তারিখে সকালে তাঁদের দুজনের জন্য দুটি ডাণ্ডী ভাড়া করে আমাদের সকলের সঙ্গে তাঁরাও রওনা হয়েছিলেন। সেদিন অপরাহ্নে চন্দনবাড়ি পৌঁছে লীডর নদীর তীরে অপর সকলের মত জলকাদার মধ্যে তাঁবুর ভিতর কয়েকজন সহযাত্রীর সঙ্গে রাত্রিবাস করতে হয়েছিল তাঁদের। সেই কষ্ট বা অসুবিধা সহ্য করতে না পেরে পরদিন বায়ুজান অভিমুখে আর এগিয়ে না গিয়ে ওঁরা দুজন প্রত্যাবর্তন করেছিলেন পহলগাঁও-এ, এবং সেখানে আমাদের জন্য রিজার্ভ করে রাখা হোটেলে গিয়ে আরাম উপভোগ করতে থাকেন।

একজন ম্যানেজার—বিনয় দাস সকলের ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস প্রভৃতি বাড়তি-জিনিসপত্র, যা পার্বত্যপথে বহন করে নিয়ে যাওয়া অসাধ্য বা কষ্টসাধ্য, তা আগলে বসে ছিলেন পহলগাঁও-এর হোটেলে। পাচক ও পরিচারকও বোধ হয় দু-একজন ছিল সেখানে। শ্রীমানি দম্পতি তাঁদের আশ্রয়ে ও ভরসায় ফিরে গিয়েছিলেন। অবশ্য আরও কয়েকজন ঐভাবে ফিরে গিয়েছিলেন, অসুস্থ হওয়ার জন্য। শ্রীমানি মহাশয় ফিরে গিয়েছিলেন অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। বলেছিলেন, পরে শুনেছি, যে যারা পাপী তারা পাপ মোচনের জন্য দেব-দর্শনে যায়; তিনি তো কোনও পাপ করেননি। তাঁর কী দরকার অত কষ্ট করে অমরনাথ দর্শন করতে যাবার। দর্শনান্তে অপর সকলে যখন পহলগাঁও-এ ফিরে আসেন তখন নাকি শ্রীমানি মহাশয় তাঁদের বর্ণিত দেব-দর্শনের বিবরণ শুনে বলেছিলেন, এরা তিন পোয়া দেখে এক সের দেখেছে বলছে। ব্যবসায়ী মানুষ। অভ্যস্ত ওজনের ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করলেন।

আমাদের কামরায় আর এক দম্পতি ছিলেন। সারপেনটাইন লেনের পুলিন ঘোষ ও তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী চপলা ঘোষ। পুলিনবাবু অমায়িক, মিশুক ভদ্রলোক। তাঁর সহধর্মিণী ক্ষীণকায়া। তিনি ট্রেনে খুব আপেল খেতেন। অজিত তাঁর নাম দিয়েছিল, "আপেল-মাসীমা"। তিনি একটু বিরক্তি প্রকাশ করায় বেশ সপ্রতিভভাবে শ্রীমান অজিত তাঁকে বললো, এ কামরায় এতগুলি মাসীমা রয়েছেন, শুধুই মাসীমা বলে ডাকলে কেউ কি বুঝতে পারবেন কাকে ডাকছি?

অকাট্য যুক্তি। তার সরল সৌজন্যপূর্ণ আমোদপ্রিয়তা এবং সকল বিষয়ে সকলের সহায়তা করতে এগিয়ে আসার জন্য কেউই তার উপর রাগ করতে পারতেন না। নিঃসঙ্গ একলা যাচ্ছিলেন সিঁথির শ্রীমতী রমলা ঘোষ। কুণ্ডু স্পেশালে এর আগেও তিনি বহুবার বহু তীর্থভ্রমণ করেছেন। এই ভদ্র-

মহিলার সেবা-পরায়ণতা ও মাধুর্য-মণ্ডিত ব্যবহার ভুলতে পারা যায় না।

আট তারিখ বিকেলে হরিদ্বার থেকে যখন আমরা চলেছি অমৃতসরের দিকে, সেদিন সন্ধ্যার পর হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে আমাদের কামরার অরুণ দাস। পেটের যন্ত্রণা ও তার সঙ্গে বারংবার বমি। তার স্থান নির্ধারিত ছিল বেঞ্চে। কিন্তু বেঞ্চে তার নাম লেখা নির্ধারিত স্থান দখল করে নিয়েছিলেন, নিজের সুবিধার জন্য, শ্রীমানি মহাশয়। অরুণকে উঠিয়ে দিয়েছিলেন বাঙ্কে। অল্পবয়স্ক শ্রীমান অরুণ সানন্দে ঐ পরিবর্তন মেনে নিয়েছিল। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ায়, বিশেষতঃ বার বার বমি করতে হওয়ায় তার পক্ষে আর বাঙ্কে ওঠা সম্ভব নয়; তাকে শ্রীমতী রমলা ঘোষ মেঝেয় পাতা তাঁর নিজের বিছানা স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিলেন।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত ছেলেটির কাছে আমরা বসেছিলাম। সাহারাণপুর স্টেশনে রেল কর্তৃপক্ষের সহায়তায় একজন ডাক্তার আনিয়ে অরুণকে পরীক্ষা করানো হ'ল। তিনি ঔষধ দিলেন। কিছুক্ষণ পরে অরুণ ঘুমিয়ে পড়লো। শ্রীমতী রমলা নিঃশব্দে আমাদের কামরা থেকে প্যাসেজ ধরে অপর কামরার দিকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন; কিন্তু সেখানে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কাছে শয়ন-উপযোগী জায়গা না পেয়ে রান্নাঘরের সামনে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অপরিচ্ছন্ন স্থানে তিনি আপন বাহু-উপাধানে শয়ন করে রাত্রিযাপন করেছিলেন। সারাপথে আরও অনেক ঘটনায় পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, কি করে তিনি পথেঘাটে সকলকে আপনার করে নিতে পারেন। এঁর কথা ভুলবার নয়।

আমাদের কামরায় অবশিষ্ট পাঁচজন ছিলাম আমরা। সহধর্মিণী অমলা দেবী সর্বত্র আমার সঙ্গে যান। তাঁর মাতাঠাকুরাণী এই সুযোগ ছাড়লেন না, আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন। আমাদের কন্যা অঞ্জলি কলকাতা থেকে গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে। সেই সঙ্গে এসেছিলেন তার বড়জা শ্রীমতী শান্তি। ওঁরা চার জন স্থান পেয়েছিলেন ট্যুরিস্ট কোচে আমাদের কামরায় মেঝেয়; আমার স্থান হয়েছিল পাশের বেঞ্চে। এই কামরায় চৌদ্দজন যাত্রী বেশ যেন এক পরিবার-ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। অপর পাশের কামরায় যে চৌদ্দ জন ছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। কেন জানি না, তাঁরা আমাদের সম্বন্ধে নিস্পৃহ ও নির্লিপ্ত ভাবে থেকেছেন বরাবর। এমন কি যেদিন ট্রেনে অরুণ দাস অত অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সেদিনও তাঁরা কেউ কষ্ট করে সংযোজক প্যাসেজ দিয়ে পনেরো পা এসে খোঁজ নেননি ছেলেটির কি হয়েছে, কেমন আছে।

পরে তাঁদের কারো কারো পরিচয় জানতে পেরেছিলাম। একজন ছিলেন

শ্রীকালীচরণ বাগচী ; চেহারায় পক্ককেশ বৃদ্ধ, কিন্তু বেশ হৃষ্টপুষ্ট সামর্থ্যযুক্ত। পহলগাঁও থেকে অমরনাথ গিয়েছিলেন ও এসেছিলেন অশ্বপৃষ্ঠে। তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও এক ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ ছিলেন।

ঐ পাশের কামরায় একটি অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে ছিল। শ্যামবাজার কীর্তি মিত্র লেনের গৌরী মিত্র। মেয়েটি খুব সপ্রতিভ ও পরোপকারী। শুনলাম কুণ্ডু স্পেশালের সহায়তায় সেও বহুস্থানে গিয়েছে এর আগে। ২৩শে আগস্ট শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন বহু-আকাঙ্ক্ষিত বহু ক্লেশসাধ্য শ্রীশ্রীঅমরনাথ দর্শনের পর রাত্রি প্রায় আটটার সময় আমি যখন পঞ্চতরণীতে আমাদের তাঁবুতে শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় ফিরে এসেছিলাম, তখনও আমার স্ত্রী কন্যা কেউই ফিরে আসতে পারেনি, তখন এই মেয়েটি কন্যার মত এগিয়ে এসে আমার বিছানা বিছিয়ে দেয়, নিজের গা থেকে মূল্যবান শাল খুলে আমাকে গায়ে দিয়ে বসতে বলে। মেয়েদের এই স্বতঃপ্রবৃত্ত সেবার স্নিগ্ধধারা সব ক্লান্তি অপনোদন করে। এদের ভিতরে থাকে এক সহজাত মায়ের মন। সেবাই যেন এদের ধর্ম।

আমাদের ট্যুরিস্ট কোচে, বলেছি, একটি মাঝের কেবিনে ছজন যাচ্ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহিষাদলের শচীন ঘোড়ই ও রাধাকান্ত ভৌমিক। আর ছিলেন দুটি দম্পতি ; কেশব বোস ও রমা বোস এবং চন্দন-নগরের সস্ত্রীক বঙ্কিম বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর একটি মেয়ে আসানসোল থেকে উঠেছিল এবং কেবিন ও রান্নাঘরের মাঝে যে সামান্য ফাঁকা জায়গা ছিল সেইখানে একটা বেঞ্চে স্থান পেয়েছিল। তার নাম স্বপ্না ঘোষ। এই স্বপ্না ও রমা আমাকে তাদের দাদুর স্থানে বসিয়ে-ছিল। আর সকলে কেউ বলতো দাদা, কেউ মেসোমশায়। তীর্থযাত্রার পথে অযাচিত প্রীতি ও শ্রদ্ধার উপকরণে মনের পাত্র পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

এমনিই হয়। সকল মানুষই স্বভাবতঃ ভাল। স্বার্থের তাড়নায়, অবস্থার চাপে অথবা ভুল বোঝার জন্য মানুষের সঙ্গে বাধে মানুষের বিরোধ ; মতান্তর থেকে মনান্তর ; ক্ষেত্রবিশেষে কলহ ও সংঘর্ষ। স্বপ্নার বয়স খুবই কম। চব্বিশ-পঁচিশের বেশী নয়। এর আগেও সে একাই গিয়েছে কেদার-বদরী। গিয়েছে পায়ে হেঁটে। এবারেও পায়ে হেঁটে যাবে পহলগাঁও থেকে শ্রীশ্রীঅমরনাথ গুহায়। সাহস ও স্বাস্থ্য দুই-ই আছে। প্রশংসনীয়। স্বপ্নার কথা পরে আবার বলতে হবে। তার সেবার ঋণ অপরিশোধ্য।

এই তো হ'ল মোটামুটি ভাবে যাত্রী অথবা সহযাত্রীদের কথা বলা। এইবার

যাত্রাপথের কথা বলতে হয়। মানুষের কথাই মনে পড়ে সর্বপ্রথম। মানুষকে নিয়েই তো সব। তাকে বাদ দিলে কী থাকে? কিছুই থাকে না। ধর্ম বা দেবতা সবই মানুষের সৃষ্টি, সবই মানুষের জন্য, মানুষকে নিয়ে।

পূর্বেই বলেছি ৩রা আগস্ট ১৯৬৪ সাল সোমবার হাওড়া স্টেশন থেকে বারানসী এক্সপ্রেস ট্রেনে আমাদের ট্যুরিস্ট কোচ সংযুক্ত হয়ে বেলা একটায় আমাদের যাত্রা হ'ল শুরু। পরদিন ৪ঠা আগস্ট সকাল নটায় বারানসী স্টেশনে পৌছে সেখানে আমাদের গাড়িখানি ট্রেন থেকে কেটে সাইডিং-এ নিয়ে গেল। সমস্ত দিন বারানসীধামে আমাদের অবস্থিতির ব্যবস্থা। কাশীধামে গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন, এ তো পুরনো হয় না। যতবারই দেখা হোক্ না কেন, আবার দেখায় আনন্দ আছে। ঐদিন অর্থাৎ ৪ঠা আগস্ট রাত্রি দশটায় বেরিলী প্যাসেঞ্জারে আবার আমাদের গাড়ি জুড়ে দিল।

পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় লক্ষ্ণৌ। পুণ্যসলিলা গোমতী স্নান করতে, শহর দেখতে নেমে গেলেন সকলে। গাড়িখানি কেটে দিয়ে সাইডিং-এ রাখা হ'ল। পরবর্তী ট্রেন রাত্রি ১২টায়। সেই ট্রেনে পুনঃ সংযুক্ত হ'ল আমাদের গাড়ি এবং পরদিন ৬ই আগস্ট বিকেলে এসে পৌছলাম লাক্সার স্টেশনে। ভাগ্যক্রমে সঙ্গে সঙ্গে হরিদ্বারগামী ট্রেন পাওয়া গেল এবং সেই ট্রেনে আমাদের গাড়ি সংযুক্ত হ'ল।

সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় পৌছে গেলাম শিবালিক পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত পুণ্যভূমি হরিদ্বারে। দুদিন সেখানে আমাদের থাকার কথা। হরিদ্বারে বহুবার এসেছি ও থেকেছি। এখানকার অপার্থিব সৌন্দর্য-সম্পদ বর্ণনা করে বোঝানো যায় না। তাই সে চেষ্টা থেকে বিরত থাকলাম।

॥ অমৃতসর ॥

৮ই আগস্ট বিকেলে অমৃতসরগামী ট্রেনে জুড়ে দিল আমাদের গাড়ি, হরিদ্বার স্টেশন থেকে। পরদিন ৯ই আগস্ট সকালে অমৃতসর পৌছলাম। আগে আসিনি। টাঙ্গাভাড়া করে শহর দেখতে গেলাম। দেখলাম দুর্গিয়ানা মন্দির।—এক সুবিশাল জলাশয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মন্দিরের বিভিন্ন

প্রকোষ্ঠে আছে রাম-সীতা, রাধাকৃষ্ণ ও মহাদেবের মর্মর মূর্তি। একটু দূরে বিরাট এক অশ্বত্থ বৃক্ষের পাদমূলে আর একটি মন্দিরে আছে দুর্গা ও মহাবীরের মূর্তি। দুর্গান্যা মন্দির দেখে, গেলাম নৃশংস মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি-বিজড়িত জালিয়ানওয়ালাবাগে। নরপিশাচ ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল ডায়ার ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল কেবলমাত্র ভীতিসৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঐ উদ্যানে সমবেত হিন্দু, মুসলমান, শিখ দুই সহস্র নিরীহ নরনারী মায় মাতৃ-ক্রোড়ে থাকা অবোধ শিশুকে গুলি করিয়ে হত্যা করেছিল। ঐ উদ্যানের চতুর্দিকে উচ্চ গৃহশ্রেণী। প্রবেশ ও নির্গমনের একটিমাত্র অপ্রশস্ত পথ। সেই পথ রোধ করে কামান সাজিয়ে বন্দুকধারী সৈন্য সমাবেশ করে ইংরেজ-কলঙ্ক ডায়ার পৈশাচিক উল্লাসে শান্তিপূর্ণ জনতার উপর প্রাণঘাতী অনল বৃষ্টি করিয়েছিল। পলায়নের পথ অবরুদ্ধ। ভীতসন্ত্রস্ত পলায়ন-উদ্যত যারা হয়েছিল ইতস্ততঃ ধাবমান, তারা এক বিস্তৃত-বদন গভীর কূপের সুশীতল তলদেশে চিরবিশ্রাম লাভ করেছিল। ১২০ জনের মৃতদেহ ঐ কূপ থেকে পরে উত্তোলিত হয়েছিল। পরাধীনতার মোহ-মুক্তির জন্য প্রথম কঠিন আঘাত আসে এই জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনায়।

এক প্রশস্ত কাষ্ঠফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কাহিনী। ব্যর্থ হয়নি সেদিনের সে সহস্র সহস্র নিহত নর-নারীর বক্ষ-নিঃসৃত রক্তস্রোত। তারই ফলে আজ স্বাধীন ভারতের জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রস্ফুটিত হয়েছে রাশি রাশি রক্ত-গোলাপ; উদ্যানপ্রান্তে নির্মিত হয়েছে প্রজ্বলিত অগ্নি-শিখার আকারে এক স্মারক-স্তম্ভ। স্মারক-সমিতির সম্পাদকের নাম দেখলাম জনৈক বাঙ্গালীর—ইউ. এন্. মুখার্জি। তাঁর পুরো নাম ও পরিচয় জানার সময় হ'ল না। তখনি আবার আমাদের যেতে হল শিখসম্প্রদায়ের সুবিখ্যাত স্বর্ণ-মন্দির দেখতে।

অপূর্ব-দর্শন, পরম উদ্দীপনাপ্রদ এই মন্দির। বিশাল সুনির্মল এক জলাশয়ের মধ্যস্থলে এই তীর্থ-মন্দির। সুবর্ণমণ্ডিত শীর্ষভাগ, নয়ন-বিমোহন শিল্পকলার পরিচয় সর্বত্র। কী পুরুষ, কী স্ত্রীলোক, অনাবৃত মস্তকে কারও এখানে প্রবেশের অধিকার বা অনুমতি নেই। শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অপরিহার্য নিদর্শনস্বরূপ সকলকেই অন্ততপক্ষে একখানি রুমাল মাথায় দিয়ে যেতে হ'ল।

কথিত আছে গুরু নানক পরিব্রাজনকালে দেখতে পান যে তাঁর প্রিয় শিষ্য ভাইবুধা অসহনীয় তৃষ্ণায় মুহ্যমান। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে জলাশয় সম্পূর্ণরূপে

বিশুষ্ক। জল কোথায়? কোথাও জলের সন্ধান পাওয়া যায় না। ধ্যান-নিমগ্ন গুরু নানক শিষ্যকে নির্দেশ দেন একান্ত বিশ্বাসে সৎ-নাম জপ করতে; বলেন, তাহলেই ঐ বিশুষ্ক পুষ্করিণী জলপূর্ণ হবে। হ'লও তাই। বিশ্বাস-ভক্তির আকর্ষণে ঐ পুষ্করিণীর শুষ্ক বক্ষ থেকে উদ্‌গত হ'ল স্নিগ্ধ সলিলধারা; পরিপূর্ণ হ'ল জলাশয়। নামকরণ হ'ল অমৃত-সায়র। যা থেকে শহরের নাম হল অমৃতসর।

পরবর্তীকালে চতুর্থ শিখ-গুরু রামদাস ঐ পুষ্করিণীর আয়তন বৃদ্ধি করে তার মধ্যস্থলে এক সুরম্য মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। আমেদশাহ্ সেই মন্দির ভেঙে দিয়েছিলেন, যখন শিখদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পেরেছিলেন।

ঘূর্ণ্যমান কালচক্রে যখন পাঞ্জাব আবার শিখেদের অধিকারে ফিরে এল তখন মহারাজ রণজিৎ সিংহ পুনর্গঠিত করান ঐ মন্দির। সোনার পাতে মুড়ে দেওয়ালেন এর গম্বুজ। সেই স্বর্ণমন্দির আমরা আজ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখলাম। শিখ সম্প্রদায়ের অমিত বিক্রম ও আত্ম-প্রত্যয়ের অজেয় শক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলাম।

ফেরার পথে প্রবেশদ্বারের পার্শ্বে দ্বিতলে অবস্থিত চিত্রশালা দেখলাম। মনে হল এ না দেখলেই ভাল হ'ত। ধর্মের নামে কী অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়ন চলেছিল এই মহাবীর্যশালী শিখ সম্প্রদায়ের উপর, তারই মর্মান্তিক দৃশ্যাবলী চিত্রিত রয়েছে বিশাল কক্ষের প্রাচীরগাত্রে। মুসলমান রাজত্বকালে ইসলাম-ধর্ম গ্রহণে অসম্মত হওয়ার অপরাধে ভাই মোতি সিং-এর দেহ উপবিষ্ট অবস্থায় বেঁধে রেখে প্রকাশ্যস্থলে তাঁর মাথা থেকে মাঝামাঝি ভাবে করাত চালিয়ে দ্বিখণ্ডিত করার দৃশ্য অঙ্কিত রয়েছে দেখলাম। দেখলাম অপর এক চিত্রে শিখ-ধর্মে-বিশ্বাসী অপর একজনের দেহ থেকে জীবন্ত অবস্থায় হস্ত পদ ও অপরাপর গ্রন্থি খণ্ডবিখণ্ড করে কেটে ফেলার দৃশ্য। কী প্রশান্ত আত্ম-প্রত্যয়ে প্রদীপ্ত তাঁর মুখমণ্ডল! দেখলাম বন্দিনী শিখজননীর ক্রোড়ে ঘাতক কর্তৃক শিশুপুত্রের ছিন্নমস্তক নিক্ষেপের দৃশ্য; শিখ-জননীর মুখে কাতরতার চিহ্ন বিন্দুমাত্র নাই, নয়ন যুগল থেকে শুধু জ্বলন্ত অগ্নি যেন নির্গত হচ্ছে।

অত্যাচার উৎপীড়নের অকথ্য অভিযান চলেছিল এই মহান্ শিখ জাতির উপর দিয়ে। তথাপি, "বাঁচিয়া রয়েছে শিখ, নির্মম নির্ভীক"। কঠোর

বাস্তবতায়, অনমনীয় আত্মপ্রত্যয়ে সু-প্রতিষ্ঠিত এই জাতি। ধর্মবিশ্বাস সত্যসত্যই এদের ধারণ করে রেখেছে। শুধু বাঁচিয়ে রেখেছে নয়, রেখেছে সমুন্নত-শির এক নির্ভীক কর্মঠ জাতিরূপে।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে এলাম স্টেশনে। সন্ধ্যা ছটায় অমৃতসর থেকে পাঠানকোটগামী একটা ট্রেনে সংযুক্ত হ'ল আমাদের গাড়ি। সেইদিনই রাত্রি ৯টায় আমরা এসে পৌছলাম ট্রেনযাত্রার শেষ স্টেশন পাঠানকোটে।

॥ কাশ্মীরের পথে ॥

পরদিন ১০ই আগস্ট স্নানাহারের পর আমাদের জন্য সংরক্ষিত দুখানি কাশ্মীর সরকারের আরামপ্রদ ট্যুরিস্ট বাসে বেলা বারোটায় আমরা রওনা হলাম কাশ্মীর অভিমুখে। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর পাঠানকোট থেকে ২৬৭ মাইল দূরে অবস্থিত। পার্বত্যপথে মোটর-বাসে ঐ দূরত্ব অতিক্রম করতে দু-দিন লাগে। তীব্র স্রোতে ধাবমানা কতকগুলি নদী সন্তর্পণে পুলের উপর দিয়ে পার হয়ে বেলা আড়াইটা আন্দাজ সময়ে আমরা এসে পৌছলাম জম্মুর সুরম্য পর্যটক-ভবনের সংলগ্ন বাস-স্ট্যাণ্ডে। এখানে চা ও জলযোগ করে আবার রওনা হলাম। সন্ধ্যার পর "কুডে" এক মনোরম উদ্যান সমন্বিত বিশ্রাম-ভবনে আমাদের নামিয়ে দিল।

জম্মু পর্যন্ত বেশ গরম বোধ হচ্ছিল, উচ্চতা বেশী নয়। কাশ্মীর রাজ্যের শীতকালীন রাজধানী। এখানে বহু মন্দির আছে। হিন্দু জন-সংখ্যার প্রাধান্য। "কুডে" পৌছে রাত্রে প্রথম ঠাণ্ডা বোধ হ'ল। পৌছলাম রাত নটায়। বিশ্রাম-ভবন বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত। কক্ষগুলি গদি-দেওয়া পালঙ্ক, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি দিয়ে সুসজ্জিত। প্রত্যেক কক্ষের সংলগ্ন বাথ-রুম। বেশ ভালই লাগলো।

তবে অবিমিশ্র সুখ বা আনন্দ কোথাও আছে কি? রাত্রি এগারোটায় বৈদ্যুতিক আলো অন্ধকারের কোলে ঘুমিয়ে পড়লো। অথচ তখনও আমাদের নৈশ আহার প্রস্তুত হয়নি। হ্যারিকেন লণ্ঠন ও মোমবাতির আলোয় রাত্রি বারোটায় আমাদের ভোজনপর্ব সম্পন্ন হ'ল। কুণ্ডু স্পেশালের প্রচার-পুস্তিকায় লেখা ছিল ঐদিন রাত্রে কুডে বিশ্রাম। আহারের কথা তো ছিল না,

আহার করতে যা পাওয়া গেল তা বাড়তির ভাগ। একথা কেউ কেউ রহস্য করে বললেন।

পরদিন ১১ই আগস্ট সকাল সাড়ে নটায় তাড়াতাড়ি স্নানাহার শেষ করে আমাদের আগের দিনের সংরক্ষিত অপেক্ষমাণ বাসে যে যার আসনে উপবিষ্ট হলাম। বাস একটু পরেই আঁকা-বাঁকা পার্বত্যপথে এগিয়ে চললো। অতিক্রম করলাম বাটোট নামে একটি সুন্দর পার্বত্য জনপদ। সুরম্য হর্ম্যরাজি পর্বতগাত্রে বৈচিত্র্যের সমাবেশে শোভমান।

পরবর্তী চল্লিশ মাইল পথ খুবই কষ্টসাধ্য বলে এক ঘোষণা-ফলক দেখা গেল পথের ধারে। ক্রমাগত অসমতল পথে চড়াই ও উৎরাই। বাস চলেছে খুব সন্তর্পণে। দৈবাৎ পথভ্রষ্ট হলে চালক ও যাত্রীসহ বাসের যে পরিণতি হবে তাতে সব একাকার হয়ে যাবে, কাউকে আর চিনবার উপায় থাকবে না। সেই সম্ভাবনাকে পাশ কাটিয়ে যাবার জন্য বাস-চালকের তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি ও পেশীবহুল হস্তের নিপুণ চালনায় সতর্কতার অন্ত নেই। তার পর ভাগ্য আর গুরুবল।

পাশে পাশে উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে গর্জনশীলা চন্দ্রভাগা। চলতি নাম চেনাব নদী। ঝুলন্ত পুলের উপর দিয়ে একস্থানে ঐ নদী পার হয়ে এলাম আমরা রামবাঁধে। এখানে বেশ কিছুক্ষণ হ'ল যাত্রা-বিরতি। আপেল প্রভৃতি ফল কিনে কেউ কেউ খেতে লাগলেন। সুবিখ্যাত "বানিহাল" পেরিয়ে এলাম বেলা প্রায় আড়াইটায়। সাঁজোয়া গাড়ি দেখা গেল সারি-বন্দী হয়ে চলেছে।

কিছুপথ এসে সম্মুখীন হলাম দু মাইল দীর্ঘ "জহর-টানেলে"র। মাত্র কয়েক বছর আগে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞের সহায়তায় এই টানেল নির্মিত হয়েছে। ফলে বৎসরের সকল সময়ে কাশ্মীর রাজ্যের সঙ্গে ভারতের অপরাপর রাজ্যের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ বিদ্যমান থাকছে। পূর্বে অতি দুর্গম এক বহু-উচ্চ পর্বত-শিখরে আঠারো মাইল পথ অতিক্রম করে যেতে হত। সেই আঠারো মাইল পথ প্রায়ই বরফে আচ্ছাদিত হয়ে বাস-চলাচলের পক্ষে অগম্য হয়ে পড়তো। তাই কেবলমাত্র আঠারো মাইল পথ বাঁচানোর জন্য নয়, বৎসরের সকল সময়ে অবিচ্ছিন্ন সংযোগ রক্ষার জন্য বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত হয়েছে এই সুদীর্ঘ টানেল। টানেলের অভ্যন্তরে সমগ্র পথ বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত। টানেলের দুই মুখে সশস্ত্র প্রহরী ও পথ-রক্ষকদের তাঁবু। সাঁজোয়া গাড়িগুলির পিছ.র ধীরে ধীরে আমাদের বাস দুখানি ঐ টানেল অতিক্রম করলো।

প্রায় দশ মিনিট লাগলো।

যাবার পথে ভেরী-নাগ দেখে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিকেল চারটায় সেখানে আমরা পৌছলাম। চিত্ত-বিভ্রমকারী অতি মনোরম উদ্যান। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬১২ খৃষ্টাব্দে এখানে এক অষ্ট-ভুজ জলাধার খনন করিয়েছিলেন। নিম্নভাগে এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রস্রবণ পরিস্ফুট হয়। সেটাই নাকি ঝিলম নদের উৎপত্তি-স্থল। ঐ উদ্যানে জলাধার সন্নিকটে রামসীতা, মহাবীর প্রভৃতির মন্দির দেখা গেল। ধর্ম ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ। উদ্যানে বসে বৈকালিক চা জলখাবার খেতে খুবই ভাল লেগেছিল। কুণ্ডু স্পেশালের ব্যবস্থাপনায় তাঁদের পরিচারক বাসেই নিয়ে এসেছিল বিস্কুট ও সিঙ্গাড়া, মিষ্টি প্রভৃতি। সঙ্গে আনা স্টোভ ধরিয়ে জল গরম করে চা তৈরী করে দিল। কাপ প্লেট প্রভৃতি সমস্ত সরঞ্জাম তাঁদের সঙ্গে সর্বত্র থাকে ও ছিল।

আবার চললো বাস। বিকেল পাঁচটায় "কাজী-গুণ্ড" পার হলাম। আরম্ভ হ'ল সমতল ভূমি। দুধারে ধানজমি। পথের ধারে পপলার গাছের সারিবদ্ধ প্রহরা। অশ্ববাহিত টাঙ্গা চোখে পড়ল। সাড়ে পাঁচটায় ছাড়িয়ে এলাম "অনন্তনাগ" নামে মহকুমা শহর।

॥ শ্রীনগর ॥

অপরাহ্ন সাতটায় এসে পৌছলাম কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগরে। সূর্য তখনও আকাশের গায়ে অপেক্ষা করে রয়েছেন, মনে হ'ল বুঝি নবাগত আমাদেরই জন্য। প্রথমে ঝিলম নদীর পুল পার হয়ে আমাদের বাস দুখানি গেল Tourist Reception Centreএর বিশাল সুদৃশ্য অট্টালিকা সংলগ্ন প্রাঙ্গণে। সেখানে যা করণীয় তা আমাদের ম্যানেজার নেমে গিয়ে করে এলেন। সেই সময়ের মধ্যে ডাল হ্রদে থাকা বহু হাউজ বোট এর লোক আমাদের কাছে এসে তাদের হাউজ বোট-এ থাকার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালো। কিন্তু তাদের কথা শুধু শুনে গেলাম। আমাদের থাকার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রয়েছে কুণ্ডু স্পেশালের হাতে। থাকা, খাওয়া, যাওয়া সব কিছুর ব্যবস্থা তাঁরাই করছেন ও করবেন।

সুতরাং যথাসময়ে তাঁদের ব্যবস্থা অনুযায়ী ডাল হ্রদের সামনেই বুলেভার্ড-

এর ধারে মনোরম উদ্যান সমন্বিত "মাজদা হোটেলে" আমরা এসে নামলাম। সামনে গেস্ট-হাউস, পিছনে হোটেল। সবটাই ভাড়া নিয়ে রেখেছিলেন কুণ্ডু স্পেশাল। ইতিমধ্যে দেখি আরও দুটি দল এঁদের এসে পৌঁছেছে। দলের Commander-in-Chief স্বয়ং শ্রীপতি কুণ্ডু মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ফকির কুণ্ডু। অতি অমায়িক ও ভদ্র প্রকৃতির সজ্জন ব্যক্তি। এঁর আর এক ভ্রাতাও এসেছেন, নাম সুবল। তাছাড়া প্রত্যেক দলের ম্যানেজার তো আছেনই। একজন বিচক্ষণ ডাক্তারও এসেছেন কলকাতা থেকে এঁদের সঙ্গে। নাম তুলসীচরণ শেঠ। কলকাতায় স্ট্র্যাণ্ড রোডে বাড়ি।

হোটেলের দোতলায় একটা ঘরে স্থান পেলেন আমার স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি চারজন। আমি থাকলাম নীচের একটা ঘরে। সে ঘরে ফকির কুণ্ডু ও আর দুজন ছিলেন। সেই ঘরেই পরিচয় হয় অর্জুন মল্লিক নামে আমোদ-প্রিয় ছেলেটির সঙ্গে। সেও আমাকে দাদু বলতে শুরু করলো। খিদিরপুরে আমার কন্যার শ্বশুরালয়ের কাছে মনসাতলা লেনে তার বাড়ি। তাদের সকলকে চেনে বললো। প্রত্যেক ঘরে চারজনের মত ব্যবস্থা।

হোটেলের রান্নাঘর কুণ্ডু স্পেশালের হাতে। তাঁদের পাচকবৃন্দ রান্না করবেন, পরিচারকরা আর সব করবে। রান্নাঘরের সংলগ্ন ছোট উঠানে একটি ফলভারে অবনত আপেলগাছ শুধু দর্শনীয় নয়, লোভনীয়ও হয়েছিল। আপেলের চাটনি ভারী মুখরোচক।

আমাদের হোটেলের ঠিক পিছনেই শঙ্কর পাহাড়, প্রায় ১০,০০০ ফিট উঁচু। তার শীর্ষদেশে এক বহু প্রাচীন শিব-মন্দির। শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে প্রতিষ্ঠিত। তথাপি ঐ পর্বতকে সাধারণতঃ শঙ্করাচার্যপর্বত বলা হয়। নীচে থেকে উপর পর্যন্ত পথ নির্মাণ ও বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন শুনলাম মহীশূরের রাণী। সম্মুখে ডাল-হ্রদে অগণিত ও বিচিত্র নামের আবাসিক জলযান অথবা ভাসমান ভবন (House Boat)। তা ছাড়া ছোট ছোট শিকারা রয়েছে পারাপারের জন্য বা জলপথে বিভিন্নস্থানে যাবার জন্য। হ্রদের ভিতর একটি ছোট দ্বীপে এক মনোরম উদ্যান নির্মিত হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে পণ্ডিত জওহরলালের নামে "জহর উদ্যান," বা "জহর পার্ক"।

কুণ্ডু স্পেশালের ব্যবস্থা অনুযায়ী ১১ই আগস্ট সন্ধ্যা থেকে ১৯শে আগস্ট সকাল পর্যন্ত শ্রীনগরে ঐ হোটেলে আমরা ছিলাম। আট রাত্রি সাত দিন।

মন্দ কি? ভূস্বর্গ কাশ্মীরে দর্শনীয় প্রধান স্থানগুলি কুণ্ডু স্পেশালের ভাড়া-করা মোটর-বাসে দেখা হ'ল।

একদিন গেলাম গুল-মার্গের পথে টঙ্গা-মার্গ। শ্রীনগর থেকে চব্বিশ মাইল দূরে। সেখান থেকে পদব্রজে, অশ্বারোহণে বা ডাণ্ডীতে পাহাড়ে উঠতে হয় চার মাইল; সেখানে অতি মনোরম পরিবেশে অবস্থিত "গুল-মার্গ" জনপদ। কাঠের তৈরী বাংলোগুলি পাহাড়ের গায়ে ছবির মত পরিস্ফুট। "গুল-মার্গে"র উচ্চতা ৮,৭০০ ফিট। আরও তিন মাইল উঠলে "খিলান-মার্গ"! বরফের উপর স্কেটিং-এর উপযোগী ক্রীড়াভূমি। উচ্চতা ১০,০০০ ফিট। দুপুরবেলাতেও শীত বোধ হ'ল সেখানে। ডাণ্ডীভাড়া লাগলো আটাশ টাকা। ঘোড়া সাড়ে পাঁচ থেকে সাড়ে ছয় টাকা। পাহাড় থেকে নেমে এসে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বেচারী ভালোমানুষ কেশব ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়ে সেই ঘোড়ারই পিছন দিকে কাকে কি বলবার জন্য যেমনি গিয়েছে, অমনি ঘোড়াটা তাকে এক চাট মেরে দিল। বেশ লেগেছিল বেচারার। দুষ্টু ঘোড়া আর কি! তার পিঠে চড়ে যাওয়ার প্রতিশোধ নিলো বোধ হয়। খিলান-মার্গে দেখলাম দুটি তাঁবু ফেলে সাময়িক চা-এর দোকান। আমরা খুব তৃপ্তি করে সেখানে বিস্কুট আর কফি খেলাম। গুল-মার্গে দেখলাম বেশ ভালো হোটেলও আছে।

আর একদিন যাওয়া হ'ল "সোনে মার্গ"। শ্রীনগর থেকে ৫০ মাইল দূরে। উচ্চতা ৮,৭৫০ ফিট। সেখানকার দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। সিন্ধু-নদের উৎপত্তি হয়েছে সেখান থেকে। প্রায়ই বরফে আচ্ছাদিত থাকে। তার অনতিদূরে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের অংশ। আর একদিন যাওয়া হ'ল "হজরৎ-বাল" ছাড়িয়ে ক্ষীর-ভবানী দর্শনে। সেখানে গিয়ে মনে পড়লো স্বামী বিবেকানন্দের কথা। তার পর দেখা হ'ল উলার হ্রদে পদ্মবন, মানস-বল প্রভৃতি। উলার হ্রদ চৌদ্দ মাইল লম্বা, সাত মাইল চওড়া। জল সুস্বাদু। ভারতের মধ্যে সুস্বাদু জলের হ্রদ এত বড় আর কোথাও নেই।

ডাল হ্রদ পাঁচ মাইল লম্বা ও তিন মাইল চওড়া। তিন ভাগে বিভক্ত। ডাল-হ্রদের দৃশ্য খুবই সুন্দর। শিকারায় ডাল হ্রদে জলবিহার আনন্দদায়ক এবং আকর্ষণীয়। একদিন সন্ধ্যায় আমরাও ঐ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। দুখানি শিকারা পাশাপাশি চললো হ্রদের বুকে। শ্রীমতী রমলা, স্বপ্না, কন্যা অঞ্জলি, শান্তি প্রভৃতি মেয়েরা সকলেই গান গাইতে লাগলো। ঘণ্টা দুই বেড়ানোর পর ঐ শিকারা করেই আমরা কৃত্রিম দ্বীপে জহর উদ্যানে গিয়ে দেখে এলাম।

সেখানেও বিশ্রাম-কক্ষ ও রেস্টুরান্ট আছে।

একদিন বিকেলে মোটর-বাস যোগে যাওয়া হ'ল শালিমার বাগ, নিশাত, চশমা-শাহী প্রভৃতি মোগল সম্রাটদের প্রমোদ-উদ্যান দেখতে। নিশাত উদ্যান প্রাঙ্গণে আমাদের জন্য প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নিশাতে ক্রম-বর্ধমান উচ্চতায় সাতটি স্তরে মনোরম পুষ্প-বাটিকা। শালিমার-বাগে বিশাল জলাধার, প্রস্তরের উপর কারুকার্যখচিত সুরম্য বিশ্রাম-কক্ষ বিস্ময়কর রুচি ও শিল্প-বোধের পরিচয় বহন করে। চশমা-শাহীতে ঝরনার জল নাকি খুব উপকারী। ছোট ছোট ফুলের মত সুন্দর ফুটফুটে মেয়েরা এক এক গোছা পদ্মফুল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বিক্রীর জন্য। এক গোছা পদ্ম কিনে স্বপ্নাকে দিলাম। দাদু বলে আমাকে। কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। কিছুক্ষণ পরে বাগানের আর এক প্রান্তে দেখি সে কার কাছ থেকে একটি সুন্দর ম্যাগনোলিয়া গ্র্যাণ্ডি ফ্লোরা সংগ্রহ করে আমাকে দিল। নিলাম তার হাত থেকে সেই সুগন্ধি ফুল। ফিরে এসে হোটেলে তার খাতায় কয়েক ছত্র কবিতা লিখে দিতে হল। লিখলাম—

স্বপ্না, তোমার ম্যাগনোলিয়া ফুল
মনে হ'ল যেন পারিজাত সমতুল।
দেখিনি তো পারিজাত, তবু মনে হয়
এর কাছে তার বুঝি হবে পরাজয়॥
স্বপ্না, তোমার স্বপ্ন-মাখা চোখে
জগৎটাকে দেখবে শুধু ভালো
তোমার চোখের স্নিগ্ধ আলো লেগে
ঘুচে যেন সবার মনের কালো॥

মেয়েটি বড় ভাল। একদিকে যেমন শান্ত-নম্র, অপরদিকে সাহসে ও নিষ্ঠায় সুকঠিন। ২১শে আগস্ট রাত্রে শেষ-নাগ হ্রদের তীরে "বায়ুজানে" একান্ত অসহায় বিপন্ন অবস্থায় ঐ স্বপ্না আমার জন্য খাদ্য ও কম্বল যেভাবে সংগ্রহ করে আমার জীবন রক্ষা করেছিল তাতে তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

শ্রীনগরে কাশ্মীর সরকারের গভর্নমেন্ট এম্পোরিয়ম, সেণ্ট্রাল মার্কেট প্রভৃতি না দেখলে কাশ্মীর দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ঐ সব দেখতে

যে যার নিজ খরচে গিয়েছিলেন। কাশ্মীরী কাজ-করা রেশম ও পশমের শাড়ি, শাল প্রভৃতি, কাঠের, চামড়ার ও Papier Mache নির্মিত খেলনা, আসবাবপত্র, বিচিত্র বহুমূল্য গালিচা, এ সমস্ত কেনার তো কথাই নেই, শুধু দেখে বেড়ানোর আনন্দ পেতেও বেশ খরচ হয়, ক্রয় করার সামর্থ্য সকলের থাকে না, থাকলেও সীমাবদ্ধ। ক্রয় অবশ্য সকলেই সাধ্যমত করলেন, অল্প-বিস্তর যে যা পারেন। বাস্কেট কিনলেন প্রায় সকলেই। প্রচণ্ড শীতে আগুন পোয়াবার জন্য একরকম ছোট মাটির ভাঁড় পাওয়া যায় ওখানে ; তার উপরে বেত মোড়া থাকে। গলায় ঝুলিয়ে রাখে কাশ্মীরী দরিদ্র অধিবাসীরা আগুন-সহ ঐ ভাঁড় বুকের কাছে। সত্যেন দত্তের কবিতায় আছে—

"হসন্তিকায় আগুন পোহায় কাশ্মীরী।"

ঐ মৃৎভাণ্ডের নাম হসন্তিকা। চলতি নাম কাংড়ী। ঐ জিনিস একটি কিনে নেওয়া হ'ল বাড়ির সংগ্রহশালায় রাখার জন্য। কিনে নেওয়া হ'ল পথের ধারে এক দোকান থেকে।

১২ই ও ১৩ই আগস্ট শ্রীনগরে প্যারেড গ্রাউণ্ডে কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর অধিবেশন হ'ল। প্রধান মন্ত্রী গোলাম মহম্মদ সাদিক মহাশয় ভাষণ দিলেন। দেখলাম তাঁর জনপ্রিয়তা। বিশাল জনসভায় তিনি যুক্তি দিয়ে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং কাশ্মীর চিরদিনই তা থাকবে। তবে অপরাপর স্থানের ন্যায় এখানেও দেখলাম বিরোধী দল—গুপ্তচর বা পঞ্চম বাহিনীর অস্তিত্ব রয়েছে। গণভোট ফ্রণ্টের আপিস রয়েছে দেখলাম। এমন কি যাত্রীবাহী এক বাস্-এ চালকের সামনে দেখলাম টাঙ্গানো রয়েছে ভারতের প্রতি একান্ত শত্রুভাবাপন্ন পাকিস্তান প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর ছবি। ঐ বাসের নম্বর ছিল J. K. A. 1931। হয়ত কিছুই নয়। তবু মনে হ'ল ঐ বাস-এর মালিক ও চালকের আনুগত্য রয়েছে বোধ হয় আয়ুব খাঁর প্রতি। ভারতের প্রতি বিদ্বেষ বহন ও প্রচার করা এবং ভারতের বুকে আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্যই তিনি খ্যাত বা কু-খ্যাত। তাছাড়া স্মরণীয় কাজ এমন কিছু তিনি করেননি, যার জন্য কোন ভারতীয় নাগরিকের কাছে তিনি বরণীয় হবেন। যার জন্য তাঁর ছবি সামনে রাখা হবে।

পরবর্তীকালে ন্যাশনাল কনফারেন্স রূপান্তরিত হয়েছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এক শাখায়। প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নামে অভিহিত।

কার্যতঃ যা ছিল তা কথার ভিতরেও সমর্থিত হ'ল। ভুলতে পারা যায় না যে আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এবং ভারতীয় নেতৃবর্গের তৎকালীন অনবধানতা, অতিরিক্ত বিশ্বাস-প্রবণতা এবং অস্বাভাবিক আদর্শবাদের সুযোগে কূটবুদ্ধি ও বিভেদ-সৃষ্টিকারী ইংরেজ তার পরিকল্পিত কাশ্মীর সমস্যাকে দীর্ঘকালব্যাপী মারাত্মক দুষ্ট-ক্ষতে পরিণত হওয়ায় সহায়তা করে এসেছে। যতদিন পর্যন্ত ভারতীয় নেতৃবর্গ পর-প্রত্যাশা পরিহার করে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নির্ভরশীল হতে সচেষ্ট ও সক্ষম না হবেন, ততদিন ভারতীয় জনগণকে নানারূপ দুর্দশা ভোগ করতে হবে।

শ্রীনগরে থাকাকালীন দুদিন বেশ বৃষ্টি হ'ল। তার মধ্যে একদিন গেলাম আমাদের হোটেলের অনতিদূরবর্তী এক বিচিত্র নামে পরিচিত কাশ্মীরী শাল, শাড়ি প্রভৃতির আড়তে। খুব বড় বড় অক্ষরে বাইরে লেখা রয়েছে Souvana the worst। বাংলায় দাঁড়ায় শোভনা, কিন্তু সব চেয়ে নিকৃষ্ট। মনে পড়লো সুসাহিত্যিক প্রমথ বিশী মহাশয়ের এক সংকলন গ্রন্থের কথা। নাম দিয়েছিলেন প্র-না-বি-র নিকৃষ্ট গল্প। প্রকাশ-ভঙ্গী সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচায়ক। সেই আড়তের ভিতরে "শাল" দেখলাম চার-পাঁচ হাজার টাকা দামের। একখানি কাশ্মীরী কাজ-করা খুব পাতলা হালকা শালের দাম শুনলাম দশ হাজার টাকা! সব মিলিয়ে শ্রীনগর-বাসের স্মৃতি শ্রীমণ্ডিত হয়ে থাকবে।

॥ অমরনাথ যাত্রা ॥

১৯শে আগস্ট সকাল নটায় আহারাদির পর বাস-যোগে রওনা হয়ে বেলা দশটায় এসে পৌঁছিলাম পহলগাঁও-এ। আমরা স্থান পেলাম নির্মীয়মাণ গল্ফ-ভিউ হোটেলে। ঠিক নীচেই বড রাস্তার ধারে পোস্টাপিস। তার পরেই বয়ে যাচ্ছে লীডর নদী যার পৌরাণিক নাম লম্বোদরী। লীডরের সঙ্গে এখানে মিলিত হয়েছে "শেষ-নাগ" নদ। পিছনে গগনচুম্বী মেঘ-মেখলা পর্বতমালা। অতি মনোরম দৃশ্য। এইস্থানের উচ্চতা ৭,২০০ ফিট। দোকান বাজার, বহু বড় বড় বাড়ি, অসংখ্য হোটেল আছে এখানে। লীডর নদীর তীরে এক সুপ্রাচীন মসজিদ রয়েছে। একটু দূরেই নব-নির্মিত

গৌরীশঙ্কর মহাদেবের মন্দির। ঐ মন্দিরের আনুষ্ঠানিক দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন ১৯৬২ সালের ৯ই জুলাই তারিখে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল ডঃ করণ সিং।

ঐ মন্দিরসংলগ্ন ভূখণ্ডে কয়েকটি তাঁবু ফেলা রয়েছে দেখলাম। একটি তাঁবুর সামনে রয়েছে শ্রীশ্রীঅমরনাথের রৌপ্যনির্মিত ছড়ি (দণ্ড) ও পতাকা। কয়েকদিন আগে শ্রীনগর থেকে শোভাযাত্রা সহকারে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী আনীত হয়েছে। ঐ শোভাযাত্রা ছড়ি ও পতাকা নিয়ে সর্বপ্রথম পৌছিবে অমরনাথ গুহায়। অপরাপর যাত্রীদল করবেন অনুসরণ। ভারপ্রাপ্ত পূজারী সন্ন্যাসী মোহন্ত রয়েছেন ঐ তাঁবুতে। অভয়-হস্ত উত্তোলন করে প্রসন্ন হাস্যে প্রণত জনকে তিনি আশীর্বাদ জ্ঞাপন করছেন। সেই আশীর্বাদ গ্রহণে আমরাও এগিয়ে গিয়ে অংশীদার হলাম। রাস্তার অপর পার্শ্বে এখানেও দেখি জহরলাল নেহেরু পার্ক।

বিকেলে দেখি বেশ ঘন কালো মেঘের দল সামনের পাহাড়ের গায়ে কি যেন খুঁজে বেড়াতে লাগলো। বোধ হয় খুঁজে পেল না। তখন কী আর করে? যে জলভার বয়ে এনেছিল তা অঝোরধারায় পৃথিবীর বুকে ঢেলে দিয়ে হালকা হয়ে উড়ে চলে গেল। সেই বৃষ্টির হাত ধরে পাহাড় থেকে নেমে এল ঠাণ্ডা। রাত্রে বেশ শীতবোধ হ'ল। আমাদের হোটেলে কাঠের ঘর তখনও সুসম্পূর্ণ হয়নি। অনেক ত্রুটি ও ফাঁক ছিল। তীর্থযাত্রার পথে যেখানে যা জোটে তাই ভাল মনে করতে পারলে মানসিক শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। তাছাড়া আর উপায় কি? "অশান্তস্য কুতঃ সুখং?"

কাল সকালে হাঁটাপথে যাত্রা শুরু হবে। যান্ত্রিক জগৎ ছাড়িয়ে পার্বত্য প্রকৃতির নিজস্ব গোপনলোকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। মোট সাড়ে আটাশ মাইল ঐ পথ।

শ্রীমতী রমলা ঘোষের অনুরোধে একটা কবিতা লিখে দিতে হ'ল। আমার পকেট বইতেই সেটা লিখেছিলাম। লিখেছিলাম তুষারলিঙ্গ অমরনাথের উদ্দেশে—

আজ শুধু তোমারেই স্মরি ;
ধূলির ধরণী থাক
ব্যথা ও বিদ্বেষ লয়ে
বিস্মৃতির মাঝে দূরে পড়ি।

জানি না চলেছি কোন্ দেশে
জানি না কেমনে যাব
দেবাদিদেবের কাছে
যাব কোন্ বেশে ?
মালিন্যের সেথা ঠাঁই নাই
সর্বতাপ-হর শুভ্র
বরফেতে আচ্ছাদিত তাই।
তুষারের লিঙ্গ মূর্তি তব
পূর্ণিমায় পূর্ণরূপ ধরি
জাগাবে বিস্ময় অভিনব।
গাহিব তোমার জয়
আমার আমিত্ব যেন
তোমাতেই লভে চিরলয়॥

পরদিন ২০শে আগস্ট প্রত্যুষে আমাদের সহযাত্রী কলকাতার অজিত, রবি, অরুণ, মহিষাদলের শচীন ও রাধাকান্ত এবং আসানসোলের স্বপ্না পদব্রজে এগিয়ে গেল। প্রথম বিশ্রামকেন্দ্র চন্দনবাড়ি দশ মাইল দূরে। সে পর্যন্ত জীপ গাড়ি চলাচলের পথ আছে। গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে শেষনাগ নদের ধারে ধারে ঘুরে ঘুরে পথ উঠে গিয়েছে ক্রমশঃ উপরদিকে। চন্দনবাড়ির উচ্চতা ৯,৫০০ ফিট। সকাল নটা থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল। চারটি বিভিন্ন দলে আগত কুণ্ডু স্পেশালের প্রায় একশ ষাটজন তীর্থযাত্রীর বিরাট বাহিনী পহলগাঁও থেকে আহারাদির পর রওনা হয়ে বেলা দেড়টায় এসে পৌছিতে লাগলো চন্দনবাড়ি।

আমরা পহলগাঁও থেকে একশ নব্বই টাকা হিসাবে দুটি ডাণ্ডী ও তিনটি ডুলি ভাড়া করেছিলাম। জিনিসপত্র পহলগাঁও-এ হোটেলে রেখে দেওয়া হ'ল। সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে যাবে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় বিছানা আর ছোটখাটো বাস্কেট ও সুটকেস। ম্যানেজার বিনয় দাস ও একজন পাচক পহলগাঁও-এ হোটেলে থেকে গেলো। আমাদের সঙ্গে স্বয়ং ফকির কুণ্ডু, সুবল, দেবী ও শঙ্কর ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন। ডাক্তার শেঠও ছিলেন। আমরা অবিশ্রাম বৃষ্টির মধ্যে কর্দমাক্ত পথে একে একে এসে পৌছলাম চন্দনবাড়িতে।

॥ চন্দনবাড়ি ॥

শেষ-নাগ নদের তীরে অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন, কাদা-ভরা ভূখণ্ডে কুণ্ডু স্পেশালের যাত্রীদের জন্য নম্বর দেওয়া আটাশটি তাঁবু ইতিমধ্যে সেখানে খাটানো হয়ে গিয়েছিল। আমাদের স্থান হয়েছিল দুই নম্বর তাঁবুতে। আমরা পাঁচজন ছাড়া আরও চারজন মহিলার। শ্রীমতী রমলা ঘোষ, স্বপ্না, গৌরী মিত্র ও শৈল দেবীর। কুণ্ডু স্পেশালের ব্যবস্থা অনুযায়ী মোট নজনকে সেই তাঁবুতে রাত্রিবাস করতে হবে। কাদার উপর ভিজে দরমা পাতা, তার উপর ভিজে যাওয়া বিছানা খুলে পেতে নেওয়া হ'ল। চারিদিকে কর্দমকুণ্ড ও অবর্ণনীয় অপরিচ্ছন্নতা। সামনেই নদীর ধারে মানুষ ও পশু একই রকম অসঙ্কোচে যার যেখানে ইচ্ছা প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে, পুরীষ ত্যাগ করছে। কী নারী, কী পুরুষ। উপায় কি? পার্শ্বের কল-কল্লোলময়ী তীব্রস্রোতা নদীতে পঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের বহু নর-নারী সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে জলে নামছিলেন, শৌচ ও স্নানের জন্য। ঐভাবে তাঁবুতে বাস করার অভিজ্ঞতা খুবই পীড়াদায়ক। কিন্তু নিরুপায়। চতুর্দিকে নিবিড় অরণ্য। শহুরে সভ্যতার স্থান সেখানে নেই। উপায়ও নেই।

সেদিন সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ অনাহারের দরুন এবং হয়ত ঐ অত্যন্ত অস্বস্তিকর পরিস্থিতির জন্য আমার শরীর হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। মেদিনীপুরে ঐ রকম হলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকা হয়। ঔষধ আসে। বেশ কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে থাকতে হয়। তারপর ধীরে ধীরে সামলে উঠি। বন্ধুবর নিতাই সিংহ ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপশন্ মতে দুই শিশি ঔষধ সঙ্গে ছিল। যাত্রার পূর্বে হাওড়া স্টেশনে মধ্যমপুত্র সুবীর এনে সঙ্গে দিয়ে গিয়েছিল। ভালই হয়েছিল। সেই ঔষধ একমাত্রা খেয়ে শুয়ে থাকলাম। কুণ্ডু স্পেশালের ডাক্তার তুলসীচরণ শেঠ অবশ্য আমাদের তাঁবুতে এসে নাড়ী দেখলেন, বুক দেখলেন; বললেন, আমার লো ব্লাড প্রেসার, সুতরাং পাহাড়ের পথে যাওয়া অসমীচীন হচ্ছে। তাঁর কথার কোনও উত্তর দিলাম না। রাত কেটে গেল।

পরদিন ২১শে আগস্ট প্রত্যুষে অজিত, অরুণ, রবি প্রভৃতি পদব্রজে রওনা হয়ে গেল পরবর্তী বিশ্রামকেন্দ্র বায়ুজান অভিমুখে। আমাদের তাঁবু থেকে স্বপ্নাও তাদের সঙ্গে গেল। মহিষাদলের শচীন ঘোড়ই ও রাধাকান্ত ভৌমিকও

ঐ পদযাত্রার সঙ্গী। কুণ্ডু স্পেশালের একজন পাচক, রমানাথ ও দুজন পরিচারক ওদের আগেই রওনা হয়ে গিয়েছিল। বাহক মারফৎ তিনটি তাঁবুও। ঐ অগ্রগামী দল বায়ুস্থানে পৌছে তাঁবু খাটিয়ে প্রতীক্ষা করে থাকবে। যাত্রীবাহিনী পরে চন্দনবাড়িতে আহারাদির পর যে যার যানবাহনে রওনা হবেন। বিছানাপত্র ও কুণ্ডু স্পেশালের রান্নার সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য যাবে অশ্বতর পৃষ্ঠে বোঝাই হয়ে। সকালে বৃষ্টি ছিল না, তবে আকাশে মেঘ ও একটা অস্বস্তিকর থমথমে ভাব। পর্বতের উপর অরণ্যের নির্জনতায় যে প্রকৃতিদেবী থাকেন তপস্যায় রত আত্ম-সমাহিত, মনে হ'ল যেন এই অবাঞ্ছিত জন-সমাগমে নিদারুণ অপ্রসন্নতায় তিনি মুখভার করে বসে আছেন। প্রাতঃসূর্য ভয়ে কোথায় লুকিয়ে গেছেন। গত রাত্রে প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরে ছিল বৃষ্টি ও প্রবল হাওয়ার মাতামাতি। পায়ে গরম মোজা, হাতে দস্তানা, মাথায় কান ঢাকা গরম টুপি, সোয়েটার ও গরম কোট-প্যাণ্ট তো আছেই, এই সবের উপর লেপ কম্বল চাপিয়েও মনে হয়েছিল বুঝি ঠাণ্ডায় গায়ের রক্ত জমে গিয়েছে ; নড়াচড়া বা পাশ ফিরে শোওয়ার শক্তি ছিল না। হাড়-কাঁপানো শীতের কথা শোনা যায় ; এ তার চেয়েও উঁচুস্তরের। এ শীত কাঁপায় না, জমিয়ে দেয় শরীরের রক্তপ্রবাহ।

চন্দনবাড়িতে কয়েকটা স্থায়ী সরকারী বাড়ি আছে। বনবিভাগের। প্রচারবিভাগের। লাউড স্পীকারে ঘোষণা শোনা গেল—প্রবল বৃষ্টিপাত হবে, যাত্রীরা প্রত্যাবর্তন করুন, এখান থেকেই বাবা অমরনাথকে প্রণাম জানিয়ে ফিরে যান। পরে জানতে পেরেছিলাম ঐ সরকারী নির্দেশ মান্য করার তাগিদে অথবা শারীরিক অ-স্বাচ্ছন্দ্যবোধে কলকাতার চিনি ব্যবসায়ী শ্রীমানি মহাশয় সস্ত্রীক প্রত্যাবর্তন করেছিলেন চন্দনবাড়ি থেকে ; পহলগাঁও-এ গিয়ে হোটেলে চার দিন অপেক্ষা করেছিলেন যাত্রীদলের অমরনাথ দর্শনের পরে সেখানে ফিরে আসার পথ চেয়ে। ওজনের হিসাবে বলেছিলেন,—এরা তিন পোয়া দেখে এক সের দেখেছে বলে। আরও অনেকে নাকি পথের দুর্গমতার জন্য চন্দনবাড়ি থেকে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছিলেন। যাক গে সে কথা।

২১শে আগস্ট সকাল প্রায় নটায় কুণ্ডু স্পেশালের যাত্রীবাহিনীর সঙ্গে থাকা "রয়টার" শ্রীশঙ্কর ঘোষ মহাশয় ব্যস্তসমস্ত হয়ে প্রত্যেক তাঁবুতে সর্ব-শেষ বুলেটিন জানালেন—শীঘ্র সকলে প্রস্তুত হয়ে রওনা হয়ে যান, এখনও বৃষ্টি

নামেনি, বৃষ্টি নামলে সামনেই যে ভয়াবহ পিশু-ঘাঁটি আছে, তাতে আর উঠতে দেবে না। আজ আর তাহলে বায়ুজান যেতে পারবেন না। চন্দনবাড়িতেই পড়ে থাকতে হবে।

অমরনাথ যাত্রায় সারাপথ নিয়ন্ত্রণ করে কাশ্মীর সরকারের সশস্ত্র পুলিস-বাহিনী। পরে দেখলাম কুমায়ুন রেজিমেণ্টের সৈন্যদলও যাত্রীদের সহায়তায় নিযুক্ত।

শঙ্করবাবুর ঐ ঘোষণা শুনে ডাণ্ডী ও ডুলিবাহকরা ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আমার আহার শেষ হওয়া মাত্র আমাকে নিয়ে তারা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হ'ল। আর সকলেরও ডাণ্ডী ডুলি প্রভৃতি প্রস্তুত। যাঁরা ঘোড়ায় যাবেন তাঁদের ঘোড়াও প্রস্তুত। চারিদিকে সাজ সাজ রব। এখনি যেতে হবে এগিয়ে। Strike the tent। আমার ডাণ্ডীবাহকরা ছিল পাঠান, সর্দারের নাম মামুদ। বলা হয়নি, হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ অমরনাথে যেতে হলে, মুসলমানদের সহায়তা চাই প্রতি পদে পদে। ডাণ্ডী বইবে মুসলমান, ঘোড়াওয়ালা মুসলমান। রাস্তার বরফ কাটবে মুসলমান। একটু গিয়েই দেখা গেল দুর্ভেদ্য জনতার ভিড়। পিশু-ঘাঁটি পর্যন্ত গিয়েছে যে সঙ্কীর্ণ পথ, তার একপাশে পাহাড়, অপর পাশে গর্জন-মুখর "শেষ-নাগ" নদ। সামনের জনতায় অশ্বারোহী আছে, পদাতিক আছে, ডাণ্ডী ও ডুলি আরোহীও আছে অজস্র। তার ভিতর দিয়ে অগ্রগমন অসম্ভব। কিন্তু অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় সুকৌশলে ঐ ভিড়ের ভিতর দিয়ে আমার ডাণ্ডীবাহকরা আমাকে পিশু-ঘাঁটির পাদমূলে নিয়ে এল; লঘুচরণে পর্বত আরোহণ শুরু করে দিল।

পিশু-ঘাঁটি অর্থাৎ পেষণ ঘাঁটি। কবে কোন্ কালে দৈত্যদের প্রাধান্য বিনষ্ট করতে দেবগণ হয়েছিলেন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ-রত। ভীষণ যুদ্ধের শেষে যথারীতি দৈত্যকুল নিহত হয়েছিল। তাদের কঙ্কাল শিলীভূত হয়ে স্তূপীকৃত হয়। তারই নাম পিশু ঘাঁটি। বিভিন্ন আকারের প্রস্তরখণ্ড এলোমেলো ভাবে পড়ে আছে, একের উপরে এক। সেইসব প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়ে যেন একটা পথের সঙ্কেত উঠে গিয়েছে দাঁড়-করানো স্ক্রু-এর প্যাঁচের মত। পাক খেয়ে খেয়ে খাড়া দেড় মাইল ঐভাবে অতিক্রম করতে হবে। এরই নাম পিশু-ঘাঁটি।

অর্ধপথে শুরু হ'ল প্রবল বারিবর্ষণ। উপর থেকে নামতে লাগলো জল-স্রোত প্রচণ্ড বেগে। সম্মুখে নিবিড় ঘন বৃষ্টিধারায় দৃষ্টি অবরুদ্ধ। আমার

ডাণ্ডীবাহকরা অদম্য উৎসাহে আমাকে বহন করে উপরে উঠছে যেন কোন যাদুবিদ্যার বলে। প্রহরারত পুলিস উপদেশ দিল সতর্ক হয়ে চলতে। কিন্তু ঐ পথে সতর্ক হয়ে চলার অর্থ বুঝতে পারলাম না। একেবারে বে-পরোয়া বা জগদীশ্বরের ইচ্ছার উপর পরিপূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল না হতে পারলে ঐ পথে ঐ অবস্থায় কেউ যেতে পারে না। চিন্তা করলে, ভালমন্দ খতিয়ে দেখতে গেলে ঐ পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। তবে দৃঢ় সংকল্প আর গুরু-কৃপা থাকলে কোনও বাধাই নিরস্ত করতে পারে না। আকাশ মেঘাবৃত, চারিদিকে বৃষ্টিধারার যবনিকা, পায়ের তলায় পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে বিপুল বেগে জলস্রোত। মাঝে মাঝে বজ্র-নির্ঘোষ। তার ভিতর দিয়ে ঊর্ধ্বলোকে চলেছি। চলেছে আরও অনেকে।

ভাবতে লাগলাম প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের চিরদিন চলে আসছে প্রভুত্ব-লাভের জন্য সংগ্রাম। চলে আসছে পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মানুষ চেষ্টা করছে প্রাকৃতিক শক্তিকে আপন আয়ত্তাধীন করে নানাবিধ কাজে নিয়োজিত করতে আর প্রকৃতি মাঝে মাঝে যেন ক্রুদ্ধ হয়ে মানুষের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিচ্ছে আকস্মিক অপ্রতিরোধ্য আঘাতে। প্রাকৃতিক রোষের বহিপ্রর্কাশ হয় বুঝি প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝায়, সর্বগ্রাসী জলোচ্ছ্বাসে, অথবা বিপর্যয়-কারী ভূকম্পনে। তবু মানুষের জয়যাত্রা অব্যাহত আছে ও থাকবে। মানুষ পৃথিবীর গণ্ডি ছাড়িয়ে মহাশূন্যে অভিযান শুরু করেছে। প্রাকৃতিক কোনও বাধাই সে মানছে না। মানবেও না। মানুষ যে অমৃতস্য পুত্রাঃ।

আমার ডাণ্ডীবাহকরা কেমন অবলীলাক্রমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে, উদ্দাম জলস্রোতের বাধা অতিক্রম করে অবশেষে পিশু-ঘাঁটির ঊর্ধ্বদেশে উপস্থিত হ'ল। বর্ষণ-স্নাত প্রকৃতি ততক্ষণে শান্ত হয়েছে। আগে পিছে বহুলোক সেখানে এসে উপনীত হ'ল। মানুষী চেষ্টার সাফল্যকে যেন অভিনন্দন করতে জ্যোতির্ময় দিবাকর মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। এক অপার্থিব স্বর্গীয় শোভায়, দিঙ্-মণ্ডল উদ্ভাসিত হ'ল। মনে হ'ল যেন এক বিরাট রঙ্গমঞ্চে দ্রুত পট-পরিবর্তন হ'ল।

এখন কিছু পথ সমতলভূমির উপর দিয়ে গিয়েছে। এখানকার উচ্চতা ১০,৫৫০ ফিট। তারপর মাঝে মাঝে চড়াই উৎরাই, কয়েকস্থানে গর্জন-মুখর জলপ্রপাত আমাদের পথের পাশে পর্বতশীর্ষ থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে দেখা গেল। ঐরকম এক জায়গায় ডাণ্ডী থেকে নেমে আমাকে কিছু

পথ হেঁটে যেতে হ'ল, তারপর খানিকটা উঁচুতে উঠতে হ'ল যাকে বলে 'ক্রল' (crawl) করে ; বসে বসে উপরের পাথর হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে। কুমায়ুন রেজিমেণ্টের বলিষ্ঠদেহ সৈন্য হাত বাড়িয়ে সকলকে সাহায্য করছিল। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা আছে অনেক। তাতে একটা শ্যামল স্নিগ্ধতা ছিল নয়নতৃপ্তিকর। সহসা দেখা গেল পথ থেকে অনেক নীচে, প্রায় ৫০০ ফুট নীচে একটি পান্নার রং-এর হ্রদ। শিশ্রমনাগ বা শেষ-নাগ হ্রদ। এর তিনদিক বেষ্টন করে এগিয়ে গিয়েছে আমাদের পথ। এই হ্রদ থেকে নির্গত হয়েছে শেষ-নাগ নদ। ঐ হ্রদের খানিকটা তুষারাবৃত, বাকী অংশের বর্ণ স্বচ্ছ সবুজ। ঐ হ্রদের পার্শ্ববর্তী তিনটি উচ্চ পর্বতগাত্র থেকে নেমে আসা হিমবাহ থেকে ওর উৎপত্তি ও পুষ্টি। জল তুহিন-শীতল। ঐ পর্বত তিনটির নাম ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। শীর্ষদেশ তুষারাবৃত। শোনা যায়, দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আরোগ্যলাভের জন্য কেউ কেউ শেষ-নাগ হ্রদে অবগাহন করতে নামেন। ফলে শুধু ব্যাধিমুক্ত নয়, দেহমুক্তও হতে হয়।

॥ বায়ুজান ॥

শেষ-নাগ হ্রদ ছাড়িয়ে তার অপরপ্রান্তে উচ্চ মালভূমিতে আমার ডাণ্ডী-ওয়ালারা আমাকে নিয়ে এল। সেখানে অনেক অস্থায়ী তাঁবু পড়েছে দেখা গেল। অস্থায়ী বা চলমান চা, বিস্কুট, রুটি প্রভৃতির দোকান। সরকারী ব্যবস্থায় মানুষের ডাক্তার, ঘোড়ার ডাক্তার এক-একটি তাঁবুতে কর্তব্যনিরত রয়েছেন দেখলাম। দেখতে পেলাম কুণ্ডু স্পেশালের তিনটি তাঁবুও খাটানো রয়েছে। একটিতে শ্রীমান অজিত প্রভৃতি ছজন রয়েছে। তার মধ্যে স্বপ্নাও আছে। তাঁবুর বাইরে সব বসে বিশ্রাম করছে। আমি হলাম সেই অগ্রগামী বাহিনীর সপ্তম সদস্য। অপর একটি তাঁবুতে রয়েছে পাচক ও পরিচারক জনতিন-চার। আমার সঙ্গে একটা ছোট বেতের বাস্কেটে জল ও কিছু কিসমিস, বাদাম, আখরোট, মিছরি প্রভৃতি ছিল। আর ছিল টর্চ ও ডেটল, ভিক্স্, অম্রুতাঞ্জন প্রভৃতি ঔষধ। খাবার জিনিস পথেই প্রায় শেষ হয়েছিল। নিজেও খেয়েছি, ডাণ্ডীবাহকদেরও দিয়েছি।

এখানে এসে বাইরে একটা পাথরের উপর বসে ডাণ্ডীবাহকদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম। তাদের চা-বিস্কুট খাবার জন্য চারজনকে দিলাম আড়াই টাকা। তারা নিজেদের গ্রামের কথা বললো। বললো অমরনাথের মাহাত্ম্যের কথা। মুসলমানরাও পূজা দেন। বটকুট নামে একটা গ্রাম আছে, সেখানকার মুসলমানেরা অমরনাথ যাত্রাপথে বরফ কেটে পথ পরিষ্কার করে। এ পথে মুসলমানের সাহায্য ছাড়া যাবার উপায় নেই। শুনলাম অমরনাথ গুহায় যাত্রী-প্রদত্ত পূজা-উপকরণের একটা নির্দিষ্ট অংশ বটকুটের দরগায় প্রেরিত হয়। আসলে দেবতার কি জাতিভেদ আছে? মানুষ তার ব্যর্থতায় সান্ত্বনা ও প্রচেষ্টায় উৎসাহ লাভের আশায় দেবতার কল্পনা করে আসছে সৃষ্টির শুরু থেকে। ভয় আর বিস্ময় এই দুই মনোভাব প্রথম অবস্থায় থাকতো দেবতা-কল্পনার পিছনে। ঐ বোধ থেকে প্রথম দেবতা হয়েছিলেন অগ্নি। ক্রমশঃ প্রভঞ্জন সৃষ্টিকারী বায়ু; মৃত্যু-বিধায়ক যম। মানব-মনের উৎকর্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শান্ত-রসের দেবতা, প্রেমের দেবতাও কল্পিত হয়েছিল।

শেষ-নাগ হ্রদের শেষপ্রান্তে বায়ুজান—যেখানে আমাদের তাঁবু পড়েছিল। সেস্থানের উচ্চতা ১২,৮৫০ ফিট। দার্জিলিং, মুসৌরি প্রভৃতি স্থানের উচ্চতার দ্বিগুণ বা তার চেয়েও বেশী। বসে বসে চারিদিকে দেখছি প্রাকৃতিক শোভাসম্পদ। বৃষ্টি ছিল না। মেঘও না। বেশ উজ্জ্বল সূর্যালোকে দূরস্থিত পর্বতচূড়ায় বরফের টোপর জ্বল জ্বল করছে। অদূরে পার্বত্য স্রোতস্বিনীর কুলু কুলু রবে অস্ফুট ঝঙ্কার। যাত্রীদের ব্যস্ততা। নিজ নিজ ভাড়া করে আনা তাঁবু খাটিয়ে স্টোভ জেলে যে যার খাদ্য প্রস্তুত করছেন। মালবাহী অশ্বতরের পরিচর্যা করছে তাদের চালকরা। আরও অনেক অশ্ব যাত্রী বহন করে এনে দিয়ে ছেড়ে দেওয়া রয়েছে। ইতস্ততঃ ঘাসের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের তাঁবুর ঠিক পিছনেই খানিকটা উঁচু পাড়মত ছিল, তার নীচে লম্বা ঘাসের জমি। প্রয়োজন মিটাবার ব্যবস্থা ঠিক আছে। থাকেও। তা ভুলে গিয়ে আমরা মানসিক উদ্বেগ ও দুঃখকষ্টের সৃষ্টি করি। অনাগত, প্রত্যাশিত শিশুর জন্য মাতৃস্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয় যে নিয়মে বা যাঁর ব্যবস্থাপনায়, সত্যিকারের প্রয়োজনের সময় প্রয়োজন মিটাবার সামগ্রীর অভাব তিনি রাখেন না। বিশ্বাস ও নির্ভরতা অক্ষুন্ন থাকলে অভাব দূরীভূত হয়; অভাবনীয় উপায়ে হয়। তার পরিচয় এই বায়ুজানে পেয়েছিলাম। এই স্থানের পৌরাণিক নাম বায়ু-বর্জন। পুরাকালে এখানে ছিল বায়ু-পূরিত-দেহ

এক দৈত্যের আবাসভূমি। মহাপরাক্রান্ত দৈত্য। যখন তখন প্রচণ্ড ঘূর্ণি-ঝঞ্ঝায় আত্মপ্রকাশ করে প্রাণীগণের ধ্বংস-সাধন করত। বিপন্ন মানুষের কাতর প্রার্থনায় ক্ষীরোদ-সাগরে শয়ান বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ হয়। তাঁর নির্দেশে শেষনাগ মহাসর্প ঐস্থানের সমস্ত বায়ু শোষণ করে নেয়, ফলে বায়ু-বর্জিত হয়ে ঐ দুর্দান্ত দৈত্যের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। দৈত্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তদবধি ঐস্থানের নাম হ'ল বায়ু-বর্জন। নীচে শেষ-নাগ হ্রদ। অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের হিরণ্ময় রশ্মি-জাল প্রতিবিম্বিত হচ্ছে জলে।

অপেক্ষা করে বসে আছি কতক্ষণে কুণ্ডু স্পেশালের অপর সকলে এসে পৌঁছবেন। তাঁদের সঙ্গে আসবে রন্ধনের উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম, আসবে আমাদের শয়নের বিছানা। আসবেন সহযাত্রীগণ। কেবলই ভাবছি—এত দেরি হচ্ছে কেন? আমি এসে পৌঁছেছি দেড়টা থেকে দুটার মধ্যে। ক্রমশঃ তিনটা, সাড়ে তিনটা, চারটা বেজে গেল। কী ব্যাপার? অবশেষে বিকেল পাঁচটায় কুণ্ডু স্পেশালের এক পরিচারক এসে সংবাদ দিল যে পিশু-ঘাঁটিতে উঠবার মুখে প্রবল বারিবর্ষণ শুরু হওয়ায় প্রহরারত পুলিস সকলকে আটকে ফিরিয়ে দিয়েছে। তার আগে যারা পিশু-ঘাঁটিতে উঠতে শুরু করেছিল বা অনেকটা উঠে গিয়েছিল তাদের আর নামিয়ে দেয়নি, সাবধানে যেতে বলেছিল। যেমন আমার ডাণ্ডীবাহকদের বলেছিল। সুতরাং সকলে ফিরে গিয়েছেন পিশু-ঘাঁটির নীচে থেকে আবার চন্দনবাড়িতে। প্রায় এক মাইল পথ। বেলা দুটা-আড়াইটা পর্যন্ত বৃষ্টি ও দুর্যোগ না থামায় আজ তাঁদের এখানে আসা স্থগিত থাকলো। শুধু ঐ সংবাদ দিতে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। চক্ষু স্থির। রাত্রে আমরা সাতজন প্রাণী না পাবো ক্ষুধা মিটাবার খাবার জিনিস, না পাবো শয়নের শয্যা, শীত নিবারণের লেপ-কম্বল প্রভৃতি।

মানসিক প্রতিক্রিয়া অবর্ণনীয়। এতক্ষণের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মনোমুগ্ধকর প্রভাব ও অনুভূতি নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেল। সকল ঔজ্জ্বল্য নিষ্প্রভ হয়ে গেল। এত দ্রুত পট-পরিবর্তন কোনও রঙ্গমঞ্চের ঘূর্ণায়মান মঞ্চেও এ সম্ভব হয় না। শরীর ও মন অসহনীয় অবসাদে ভেঙে পড়লো। সঙ্গে থাকা প্ল্যাস্টিকের ওয়াটারপ্রুফ কোট মাটিতে পেতে তার উপর শুয়ে পড়লাম। মাথা রাখলাম বেতের বাস্কেটটা কাত করে তারই উপরে। অনেকক্ষণ কিছু না খেতে পাওয়ায় শরীর ঝিমঝিম করতে লাগলো। কিন্তু নিরুপায়। অনাচ্ছাদিত মাটি ভেদ করে একটা অবর্ণনীয় শৈত্য উদ্‌গত হচ্ছিল নীচে

থেকে, আর উপর থেকে মনে হ'ল যেন তাঁবু ভেদ করে অদৃশ্য বরফের চাপ নেমে আসছে। তখন প্রথম কর্তব্য মনে হ'ল চন্দনবাড়িতে একটা সংবাদ প্রেরণ করা যে এখানে আমি নির্বিঘ্নে পৌছেছি। কুণ্ডু স্পেশালের যে পরিচারক সংবাদ বহন করে এসেছিল সে তখনি চন্দনবাড়িতে ফিরে যাবে বললো। পকেট-বই থেকে কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে লিখে নাম সই করে দিলাম যে আমি এখানে নির্বিঘ্নে পৌছেছি ও ভাল আছি। চিন্তার কারণ নেই।

পরে শুনেছি খুব ভাল করেছিলাম লিখে দিয়ে। কেননা সন্ধ্যার পরেই নানা গুজব অনেকে (বন্ধুভাবেই) পৌছে দিচ্ছিলেন আমার সহধর্মিণীর কাছে। তিনিও তো অন্য সকলের সঙ্গে পিশু-ঘাঁটির মুখে বৃষ্টির জন্য পুলিস কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে চন্দনবাড়ি ক্যাম্পে ফিরে গিয়েছিলেন। কোথা থেকে খবর রটেছিল যে একটা ডাণ্ডী নাকি পিশু-ঘাঁটিতে উঠবার সময় বৃষ্টির বেগে নীচে পড়ে চুরমার হয়ে গিয়েছে। কেউ বললেন আমার সহধর্মিণীকে ঐ চন্দনবাড়ি থেকে পরদিন সকালেই অন্য অনেকের সঙ্গে পহলগাঁও-এ ফিরে যেতে। দুঃখ প্রকাশ করে কেউ কেউ বলেছিলেন, তীর্থে এসে এ কী দুর্দৈব, এখন ওঁরা একলা, অর্থাৎ আমাকে বাদ দিয়ে, বাড়ি ফিরে যাবেন কি করে? সকলেই ভাল উদ্দেশ্যে ও সহানুভূতি দেখাতে ঐ সব কথা বলেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সহধর্মিণী নীরবে সব শুনেছিলেন আর সঙ্গে থাকা গুরুদেব দণ্ডীস্বামী শিবানন্দ সরস্বতীর ছবি বার করে যা কিছু জানাবার তাঁকেই জানিয়েছিলেন। রাত্রি দশটার পর কুণ্ডু স্পেশালের পরিচারক মারফৎ আমার লেখা চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হন। পরিচারকের ভাগ্যে পাঁচ টাকা বকশিশ জুটেছিল ঐ চিঠি নিয়ে আসার জন্য।

এ তো গেল ওদিককার কথা। এদিকে বায়ুজানে খাদ্যহীন শয্যাহীন অবস্থায় আমার যে অবস্থা হতে লাগলো তাকে ভাল থাকা বলে না। লিখে তো দিয়েছি—ভাল আছি। তা ছাড়া আর কীই বা লেখা চলতো? কিন্তু ভাল থাকার জন্য কোনও ব্যবস্থা করারও উপায় হ'ল না। শ্রীমান অজিত খুব উৎসাহী ছেলে। অদূরবর্তী কাশ্মীর সরকারের ক্যাম্পে গিয়ে কয়েকখানি কম্বল চেয়েছিল, পেলো না। দোষ দেওয়া যায় না। কাশ্মীর সরকার কম্বল প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছেন গরীব তীর্থযাত্রীদের জন্য। আমরা "গরীব" সংজ্ঞার মধ্যে আসি না। কাজেই সেরাত্রে ব্যবহারের জন্য কোনও কম্বল আমরা পেলাম না। দিনের আলো থাকতে থাকতে অজিত কুণ্ডু স্পেশালের

তৃতীয় তাঁবুটি লোক দিয়ে খুলিয়ে সেটি দুই ভাঁজ করে আমাদের অধিকৃত তাঁবুর মাটিতে বিছিয়ে নিল। তার উপরে ওয়াটারপ্রুফ পেতে নিয়ে আবার আমি শুয়ে পড়লাম। অল্পক্ষণের মধ্যে হাত-পা অবশ হয়ে গেল, বোধশক্তি তিরোহিত হ'ল। কথা বলার ক্ষমতাও আর রইল না। ক্ষুধার তাড়নায় ক্রমশঃ হতচেতন হয়ে গেলাম।

সে অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম এবং সে সময় কি মনে হচ্ছিল তা গুছিয়ে বলা অসম্ভব। শুধু একটা অশরীরী অনুভূতির কথাই মনে পড়ে। সে অবস্থায় বিশেষ করে কারো কথা মনে হয়নি; কোনও রকম ভয়ের কথাও ভাবিনি। সহসা মনে হ'ল কে যেন ডাকছে। শুনতে পেলাম কে যেন খুব কাছে এসে বলছে—দাদু উঠুন, খাবার এনেছি। "খাবার এনেছি" শুনতে পেয়ে আপনা হতে চোখ খুলে গেল; তাকিয়ে দেখতে পেলাম আমার পাশে বসে রয়েছে স্বপ্না নামে সেই মেয়েটি। তার দু হাতে দুটি টিফিন ক্যারিয়ারের বাটি। দেখছি, কিন্তু তখনও ঠিক যেন ধারণা করতে পারছিলাম না কোথায় আছি। স্বপ্না আবার বললে, "উঠুন, আপনার জন্যে ভাত নিয়ে এসেছি।" ভাত? ধীরে ধীরে উঠলাম। দেখি একটা বাটিতে সদ্যপ্রস্তুত গরম ভাত, বাটিতে বেগুনের ঝোল। উঠে বসে কয়েক গ্রাস খেলাম। তীব্র ক্ষুধার তাড়নায় সমস্ত দেহ তখন অবসন্ন। কী উপাদেয় যে লাগলো সেই খাদ্য তা বলে বোঝানো যায় না। স্বপ্নাকেও খেতে বললাম। খেলো সে। অজিতরা কিছু মোটা মোটা বিস্কুট ও রুটি সংগ্রহ করে এনেছে দেখলাম একটা চলমান হোটেল থেকে। গরম চাও এনেছিল ফ্লাস্কে করে একটা চায়ের দোকান থেকে। তারা তাই খেয়ে নিল।

স্বপ্নাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম সে আমার ঐ রকম অবসন্ন অবস্থা দেখে এ-তাঁবু সে-তাঁবু করে ঘুরে দেখছিল কোথাও কেউ রান্না করছিল কিনা। সে দেখেছে আমি ভাত ছাড়া আর কিছু খেতে পারি না, সহ্য হয় না। একটা তাঁবুতে সে দেখতে পায় স্টোভে ভাত রান্না হচ্ছে। এক পাঞ্জাবী পরিবার ছিলেন সেই তাঁবুতে। লুধিয়ানার এক ব্যবসায়ী, নাম সুরেন্দ্র কাউর। চলেছেন সপরিবারে অমরনাথ দর্শনে। প্রবীণ ভদ্রলোক। স্বপ্না তাঁকে গিয়ে বলেছিলো—"পিতাজী, মেরা দাদু ভুক্-সে বে-হুঁশ হো গয়া, কুছ খানা হ্যায় আপকো পাশ?" পিতাজী সম্বোধনে প্রৌঢ় ভদ্রলোক সাড়া না দিয়ে পারেননি। সদ্যপ্রস্তুত ভাত একবাটি দিয়ে...

বেগুনের ঝোল এক বাটি দিয়েছিলেন। চরম প্রয়োজনের সময় কোথা থেকে কার হাত দিয়ে যে আবশ্যকীয় দ্রব্য এসে পড়ে তা সাধারণ বুদ্ধির অতীত। মনে পড়ে গেল আচার্য শঙ্করের উক্তি—"বাতুলঃ তব কিং নাস্তি নিয়ন্তা?" নিয়ন্তা আছেন বইকি। তাঁরই নিয়ন্ত্রণে খাদ্য জুটলো; তারপর কেটে গেল সেই দুর্বিষহ শয্যাবিহীন রাত প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্য দিয়ে। চারিদিকে তুষারাবৃত পর্বতশীর্ষ আর সেই প্রায় ১৩,০০০ ফিট উঁচুতে নগ্ন-পাহাড়ের তুহিন-শীতল ক্রোড়ে এভাবে রাত্রিবাস অচিন্তনীয়।

সন্ধ্যার পরে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এলেন অপর একজন গেরুয়াধারীকে সঙ্গে নিয়ে। বললেন ওঁরা ধর্মার্থ বিভাগের লোক। এখনি তাঁরা ফিরে গিয়ে আমাদের জন্য কম্বল পাঠিয়ে দেবেন; জানতে এসেছেন কতগুলি কম্বল দরকার। আর বললেন তাঁরা নীচে পাতবার জন্য দরমা পাঠিয়ে দেবেন, আমরা যে তাঁবুটি দু-ভাঁজ করে পেতে রেখেছি সেটি তাঁরা চান। আমি সানন্দে সম্মতি দিলাম। কিন্তু খুব বাহাদুরি ও প্রশংসনীয় বুদ্ধি অজিতের। সে আমায় বাংলায় বললে, "মেসোমশায়, ওঁরা দরমা আর কম্বল পাঠিয়ে দিন, সেই সময় সেই লোকের হাতে আমরা তাঁবুটা গুটিয়ে তুলে দিয়ে দেব।" সেই কথা আমি তাঁদের ইংরাজীতে বললাম। কি বুঝলেন জানি না, তাঁরা সেই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে ফিরে গেলেন; আর এলেন না। কম্বল বা দরমাও এল না। পরে জানতে পেরেছিলাম ধর্মার্থ বিভাগের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগ ছিল না। কেবলমাত্র আপন স্বার্থে অর্থাৎ তাঁবুটি কোনওক্রমে হস্তগত করতে ঐ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তাঁরা। ভাগ্যে তখন অজিতের কথা শুনে তাঁবু নিয়ে যেতে দিইনি! কুণ্ডু স্পেশালের ভাড়া করা তাঁবু, এঁরা কোথায় নিয়ে যেতেন; কে জানে? আর, ফলে আমাদের শুয়ে থাকতে হ'ত একেবারে ভূমিশয্যায়।

স্বপ্না আরও বাহাদুরি দেখালো। একটু পরে আমার জন্য একখানি কম্বল ও সংগ্রহ করে এনেছিল। তারই এক অংশ তাকেও গায়ে দিতে বললাম। আমার গরম স্যুট পরা ছিল, যার প্যাণ্টের ভিতরে পুরা মাপের আণ্ডার-অয়ার, কোটের নীচে সোয়েটার ও গরম শার্ট। মাথায় কান-ঢাকা টুপি, হাতে গরম দস্তানা, পায়ে গরম মোজা। সেইসব পরা অবস্থায় শুয়ে পড়েছিলাম। সমস্ত [illegible]ভাবে কেটে গেল। পাশ ফেরার ক্ষমতা ছিল না। ভীষণ মাথার

যন্ত্রণা এবং মাঝরাতে বুকের ডানপাশে তীব্র খোঁচা-বেঁধা কষ্ট হতে লাগলো। কোনও রকমে হাত বার করে বেতের বাস্কেট থেকে ভিক্স্ নিয়ে খানিকটা জামার ভিতরে বুকে মালিশ করলাম। একটু পরে সে উপসর্গের উপশম হ'ল। কিন্তু মাথার যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে পড়লো। তার সঙ্গে শ্বাসকষ্ট। ভাবলাম এবারের মত আমার পার্থিব অস্তিত্বের বুঝি ঐখানেই পরিসমাপ্তি। কী আর করবো?

তা যদি হয়, হবে। এ দেহ চিরস্থায়ী নয়। চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি বছর এই দেহ আমাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। এখন আর যদি না দিতে পারে, বলবার বা করবার কিছু নেই। যেখান থেকে এসেছি আবার সেইখানে ফিরে যাব, জলবিন্দু জলাশয়ে মিশে যাব। আর সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা যদি এমন পবিত্র উর্দ্ধলোকে হিমালয়ের কোলে শুয়ে হয়, মন্দ কি? এ বরং পরম কাম্য।

হঠাৎ মনে হ'ল যাঁরা আমার সঙ্গে এসেছেন এই তীর্থযাত্রায় তাঁদের কথা। সংসারে যিনি সুদীর্ঘকাল ধরে আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে সকল সময়ে সকল অবস্থায় আমার সঙ্গে আছেন, মনে পড়লো সেই সহধর্মিণীর কথা। তাঁরা সকলেই মানসিক আঘাত পাবেন, দেব-দর্শন করতে এসে বিপন্ন হয়ে ফিরে যাবেন। এই সব কথা মনে এল বৈকি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল দণ্ডীস্বামী শিবানন্দ সরস্বতীর পত্রে লিখিত শেষ আশ্বাসবাণী—"বিশ্বাস করিয়ো আমি সর্বদা তোমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিব।" মুদ্রিত নয়নে তাঁর মহিমা-মণ্ডিত দিব্য মূর্তি প্রতিভাত হ'ল। মনে হ'ল যেন গঙ্গোত্রী-নিবাসী পরিব্রাজকাচার্য সন্ন্যাসীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল বিদেহী সত্তা আমার শারীরিক সকল কষ্ট সকল যন্ত্রণা নিঃশেষে আকর্ষণ করে নিলেন। যেমন দেখেছিলাম একবার তাঁর ভক্তশিষ্যের পিতার দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি নিজ শরীরে আকর্ষণ করে নিয়েছিলেন শিষ্যের কাতর প্রার্থনায়। বাকী রাত অতিবাহিত হ'ল শান্তিপ্রদ সুনিদ্রায়। তিনি ঠিক লক্ষ্য রেখেছেন।

সকালে সুস্থ দেহে গাত্রোত্থান করলাম। বাইরে এসে দেখি মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যোদয় হ'ল। নূতন দিনের তারিখ পড়লো ২২শে আগস্ট। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মনের রয়েছে অবিচ্ছিন্ন সংযোগ। প্রকৃতির প্রভাব প্রতিফলিত হয় মানুষের মনের দর্পণে। গত দু-তিন দিনের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও মাঝে মাঝে ধারাবর্ষণ আমাদের মানসপট সংশয়াচ্ছন্ন করেছিল বৈকি। আজ বাহিরের মেঘমুক্ত আকাশ যেন ইঙ্গিত করলো আমাদের চিত্তাকাশকে সংশয়মুক্ত করতে, এগিয়ে যেতে। চন্দনবাড়িতে শোনা গিয়েছিল, বায়ুজানেন্দ্র...

শুনলাম, একাধিকবার সরকারী ঘোষণা হয়েছিল যে প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, অমরনাথ পর্যন্ত যাওয়া অসম্ভব ; সুতরাং যাত্রীদল যেন ঐখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন, ঐখান থেকেই অমরনাথের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করেন। পরে শুনেছি কেউ কেউ ফিরে গিয়েছিলেন। অনেকে বা বেশীর ভাগ লোকই ফিরে যাননি। আমরাও ফিরিনি। আর একটা দিন মাত্র। আগামীকাল অর্থাৎ ২৩শে আগস্ট শ্রাবণী পূর্ণিমা। অমরনাথ গুহায় প্রকটিত তুষারলিঙ্গ দর্শনের শুভদিন। অমরনাথের "ছড়ি" (অর্থাৎ রৌপ্যনির্মিত দণ্ড), পতাকা প্রভৃতি প্রথা অনুযায়ী আগে আগে চলে গিয়েছে শোভাযাত্রা সহকারে। বায়ুজান থেকে সাত-আট মাইল গেলেই পঞ্চতরণী ; যাত্রাপথে তৃতীয় এবং শেষ বিশ্রামস্থল। তারপর আর সাড়ে চার মাইল গেলেই অমরনাথ গুহা।

আগেই বলেছি ২২শে আগস্ট সকাল থেকেই সূর্যালোকে দিঙ্-মণ্ডল উদ্ভাসিত। জীব জগৎ উৎফুল্ল, আশান্বিত। বেলা প্রায় একটায় কুণ্ডু স্পেশালের যাত্রীদল একে একে এসে পৌছতে লাগলেন বায়ুজানে ; আমাদের আশ্রয়-তাঁবুর সামনে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড মুখরিত হ'ল। এই যাত্রী-বাহিনীতে পদাতিক, অশ্বারোহী, রথারোহী (এখানে মনুষ্যবাহিত রথ অর্থাৎ ডাণ্ডী, ডুলি প্রভৃতি) নিয়ে প্রায় একশ ষাটজন স্ত্রী-পুরুষ ছিলেন। আমি তৎপূর্বেই অজিত প্রভৃতির সংগ্রহ করে আনা কিছু মোটা বিস্কুট ও একখানি মোটা রুটি চা দিয়ে খেয়ে বাইরে একটা উঁচু পাথরের উপর বসে দেখছিলাম। দেখছিলাম অপরাপর যাত্রীদের কর্মব্যস্ততা। আসছেন, তাঁবু খাটাচ্ছেন, রান্নার ব্যবস্থা করছেন। আবার আগের দিন যাঁরা জোরে বৃষ্টি নামার পূর্বেই পিশু-ঘাঁটি ছাড়িয়ে আসতে পেরেছিলেন এবং তার ফলে বায়ুজানে এসে পৌছতে পেরেছিলেন তাঁরা তাঁবু খুলে নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে মাল বোঝাই দিয়ে এগিয়ে যাবার উপক্রম করছিলেন। চলেছে জনস্রোত। বিরতি নেই। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসেছেন তীর্থযাত্রীদল। কয়েকজনের সঙ্গে দেখলাম শিশুসন্তান। ভাড়া-করা বাহকের ক্রোড়ে অথবা নিজেদের কোলে চলেছে। শুনলাম মানত থাকে, অমরনাথে নিয়ে এসে দর্শন ও পূজা দিয়ে যাবেন ছেলে হলে এবং ক'বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকলে।

আমাকে বেশ সুস্থ সহজ ভাবে বসে থাকতে দেখে কুণ্ডু স্পেশালে আমার সহযাত্রীদের মধ্যে অনেকে আমার কাছে এসে আনন্দমিশ্রিত বিস্ময় প্রকাশ করলেন। কেউ আমার পদধূলি নিলেন, বললেন গুরুবল আছে, নইলে

বিছানাবিহীন অবস্থায় এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় রাত কাটালেন কি করে। কেউ করলেন আলিঙ্গন। একজন একটু তিরস্কারের সুরে বললেন, বেশ মশাই, আচ্ছা লোক আপনি! বাহাদুরি করে যে এগিয়ে চলে এলেন কাল অমন সর্বনেশে বৃষ্টি মাথায়, পথে একটা কিছু হলে ভদ্রমহিলা (মানে আমার স্ত্রী) একা দেশে ফিরে যেতেন কি করে, তা একবার ভাবলেন না? কে দেখতো? কে কি করতো? আমি একটু পরিহাসের লোভ সম্বরণ করতে না পেরে বললাম, কেন, আপনারা রয়েছেন, ওঁর ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চয় করতেন। তবে সেই পরোপকার করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে দুঃখিত হলেন নাকি? আশেপাশে অনেকে হেসে ওঠায় ভদ্রলোক অপ্রতিভ হয়ে গেলেন। আমি তাঁকে আঘাত করবার ইচ্ছায় ওকথা বলিনি, একটু পরিহাস করতে চেয়েছিলাম। যাই হোক, মনে হ'ল, না বললেই ভাল হ'ত। সকলের সব কথা, সব কাজ বেশ সহজ ভাবে নিতে পারাই তো উচিত। কিন্তু পারি না। অনেকক্ষেত্রে পারা যায় না। অপ্রত্যাশিত ও অযথা আঘাত বহুবার বহু স্থানে পেয়ে মনের প্রশান্তি গিয়েছে বিনষ্ট হয়ে। বুঝি এটা ভাল নয়। তবুও পারি না জিহ্বা সংযত রাখতে। এগিয়ে গিয়ে ঐ ভদ্রলোকের হাত দুটি ধরে বললাম, কিছু মনে করবেন না, একটু রহস্য করছিলাম আর কি। তিনি আনন্দে আমাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। সৌম্যদর্শন ডাঃ শেঠ এগিয়ে এলেন, কুশল-প্রশ্ন করলেন। বললাম, এখন ভালই আছি। রাত্রে ভীষণ মাথার যন্ত্রণা ও শ্বাসকষ্ট বোধ করছিলাম। শুনে তিনি বললেন, ওটা হয়েছিল অক্সিজেনের অভাবে। এত উঁচুতে অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসকষ্ট অনেকের হয়, মাথার যন্ত্রণাও হয় ঐ কারণে।

॥ পঞ্চতরণী ॥

অল্পক্ষণ বিশ্রাম ও কিছু জলযোগের পর কুণ্ডু স্পেশালের যাত্রীবাহিনী আবার সচল হ'ল। অগ্রসর হলাম পঞ্চতরণী অভিমুখে। সামনে মহাগুণা পাশ। পনেরো থেকে যোলো হাজার ফিট উঁচু সমুদ্রতট থেকে। তুষারাবৃত বিস্তীর্ণ পার্বত্যপ্রদেশ। সেখানে পৌছে দেখি দুটি তাঁবুতে সরকারী ডাক্তার রয়েছেন অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিয়ে। এখানে নাকি যাত্রীদের কারো

শ্বাসকষ্ট হয় অক্সিজেনের অভাবে। চারিদিকে জমাট বরফ। সূর্যরশ্মি তাতে প্রতিফলিত হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। অনেকে কালো চশমা পরে নিলেন। আমরাও পরে নিলাম। সঙ্গে ছিল। যথাস্থানে বলা হয়নি, অজিত, অরুণ, রবি, শচীন, রাধাকান্ত, স্বপ্না যারা অনন্যসহায় হয়ে আপন পায়ে ভর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সংকল্প করেছিল তারা আজ সকালেই আমার জন্য কিছু চা ও রুটি যোগাড় করে দিয়ে পদব্রজে এগিয়ে গিয়েছিল। গতরাত্রে অজিত জিজ্ঞাসা করেছিল আমার অভিমত। অর্থাৎ ফিরে যাব না এগিয়ে যাব। তারা কি করবে বা তাদের কি করা উচিত তাও জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি বলেছিলাম, দর্শন না করে ফিরে যাব না। এগিয়ে যাব,—অমরনাথ দর্শনে। তারাই বা ঐখান থেকে ফিরে যাবার কথা ভাবছে কেন? ছেলেদের দুই-একজন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। উৎসাহ করে বেরিয়েছে, কিন্তু ঐ দুর্গম পার্বত্যপথে ক্রমাগত চড়াই উৎরাই ভাঙতে ক্লান্ত হওয়ারই কথা। মহিষাদলের ছেলে দুটির কাছে দেখলাম ছোট কৌটায় কিছু ওষুধ ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ তোমরা ব্র্যাণ্ডি আনোনি? অজিত অথবা রবি একটু সঙ্কুচিত ভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বলল, আছে। দেখাল একটা চ্যাপটা বোতলে ব্র্যাণ্ডি রয়েছে। বললাম, খাও তোমরা প্রত্যেকে, খানিকটা চায়ের সাথে। আর খেয়ে নাও অ্যানাসিন। তাই করল সকলে। ঐ পথে অনেকের সঙ্গে দেখেছি ব্র্যাণ্ডি ছিল। মধু ও সুরা শরীর গরম রাখে ও তেজোবর্ধক। সর্বশক্তি-সমন্বিতা দেবী চণ্ডিকাও মহিষাসুর বিনাশের পূর্বে বলেছিলেন, "গর্জ, গর্জ, ক্ষণং মূঢ়! মধু যাবৎ পিবাম্যহং। ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ॥" মধু পান করে তিনি শত্রুনিধনকারী শক্তিবৃদ্ধি করেছিলেন।

ওরা সকালেই পদব্রজে পঞ্চতরণী অভিমুখে এগিয়ে গিয়েছিল। আমরাও চলেছি। পথে বিস্তীর্ণ তুষার-ক্ষেত্র অতিক্রম করে মাঝে মাঝে দেখতে পেলাম কলস্বনা নির্ঝরিণী, কোথাও উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে প্রবাহিতা স্রোতস্বিনী, কোথাও আবার গর্জনশীল জলপ্রপাত। সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় পৌঁছলাম পঞ্চতরণীতে। এক ভদ্রমহিলা ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে পা ভাঙলেন। কী দুর্দৈব! ডাঃ শেঠ অসীম ধৈর্য ও যত্ন সহকারে ঐরকম স্থানেও তাঁর ভাঙা পা কুণ্ডু স্পেশালের সঙ্গে থাকা একটা কাঠের বাক্স থেকে দুই খণ্ড কাঠ কেটে বার করে নিয়ে তাই দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। ভদ্রমহিলা কাতর হয়ে পড়লেন। অত দূরে গিয়েও অমরনাথ দর্শন করতে যেতে পারলেন না। একেই বলে ভাগ্য।

শুধু ইচ্ছা থাকলেই তীর্থে উপনীত হওয়া বা দেবদর্শন করা সম্ভব হয় না। অর্থ, সামর্থ্য ও ইচ্ছা থাকার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সব কিছুর উপরে চাই কৃপা, গুরুবল। শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি। কত বাধাবিপত্তি উদ্ভূত হয় সৎকাজের সাথে।

হয় আমাদের একাগ্রতার পরীক্ষা করতে অথবা যাঁরা দুর্ভাগ্যক্রমে পথ থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন বা অন্য যে কোনও কারণে দর্শন-বঞ্চিত হলেন তাঁদের দুঃখে সহানুভূতি জানাতে প্রকৃতি আবার সন্ধ্যায় ক্রন্দনশীলা হলেন, ঝুরঝুর করে বৃষ্টি শুরু হ'ল। আমরা যাত্রীদল এসে পৌঁছেছি পঞ্চতরণীতে নদীতীরবর্তী সমতল ভূখণ্ডে, যেখানে আমাদের আটাশটি তাঁবু খাটানো হবে, ঠিক করা আছে। কিন্তু তাঁবুগুলি তখনও এসে পৌঁছয়নি। এদিকে ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা থেকে মেঘের দল আকাশে ছড়িয়ে পড়লো, ঢেকে গেল সমস্ত আকাশ; শুক্লা চতুর্দশীর রাত্রি রূপান্তরিত হ'ল অন্ধকারময় অমানিশায়। মনে হ'ল যেন প্রকৃতি সর্বাঙ্গে কালো কাপড় জড়িয়ে দেখতে এসেছেন এই চারিদিকে পাহাড়-ঘেরা পাঁচটি পার্বত্য তরঙ্গিণীর কূলে নির্জন শান্তিপূর্ণ উপত্যকায় এত লোক সমাগম কেন। আমাদের বিছানাগুলি এসে গিয়েছে প্রায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই। সেগুলি যথাসম্ভব বৃষ্টি-নিবারক ক্যাম্বিসের হোল্ডঅলে আবদ্ধ। কতকগুলির উপরে অয়েল-ক্লথ বা রাবার-ক্লথ জড়ানো। তারই উপরে আমরা বসে আছি ছাতা মাথায় বর্ষাতি গায়ে। বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে অবিরাম ধারায়। উন্মুক্ত আকাশের নীচে ঐ বিচিত্র অভিজ্ঞতা মন্দ লাগছিল না। কুণ্ডু স্পেশালের লোকেরা কয়েকটি হ্যারিকেন লণ্ঠন ও একটা হ্যাজাগ জাতীয় তীব্র আলো জ্বেলে আমাদের আলোর অভাব দূর করেছিলেন। আশ্চর্য তৎপরতায় ঐ পরিবেশে লুচি ও হালুয়া প্রস্তুত করে ছোট ছোট থালায় প্রত্যেকের হাতে পৌঁছে দিলেন।

বৃষ্টির বিরাম নেই। পড়েই যাচ্ছে। আকাশ যেন তার সন্তাপসঞ্চিত সমস্ত বেদনাভার নিঃশেষে নামিয়ে দিতে চায় সর্বংসহা ধরণীর বুকে। এক হাতে ছাতা ধরে রেখে পায়ের হাঁটুর উপর রাখা থালা থেকে লুচি ও হালুয়া তুলে তুলে খাওয়া দুর্লভ অভিজ্ঞতা। অবিস্মরণীয়। সবই ভাল লাগছিল। কালই পাবো বহু আকাঙ্ক্ষিত অমরনাথ দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করতে। তুষার-তীর্থ অমরনাথ। যাঁর অপর নাম মরণ-নাথ। মৃত্যুভয় জয় করতে না পারলে যাঁর দর্শনলাভ হয় না। শেষ হ'ল ঐভাবে আমাদের নৈশ আহার-পর্ব। তাঁবুর প্রতীক্ষায় বসে আছি। তাঁবু এসে পৌঁছল অনেক দেরিতে। সব তাঁবুগুলি সেই বৃষ্টির মধ্যে স্বল্প আলোকে যখন খাটানো শেষ হ'ল তখন রাত্রি বারোটা।

নিজ নিজ নির্ধারিত নম্বরযুক্ত তাঁবুতে অর্ধ-সিক্ত বিছানা খুলে পেতে নেওয়া হ'ল। তারই আশ্রয়ে নিদ্রামগ্ন হলাম। পঞ্চতরণীর উচ্চতা ১২,০০০ ফিট। খুব ঠাণ্ডা বোধ হ'ল।

পরদিন শ্রাবণী পুর্ণিমা ২৩শে আগস্ট। সকালে শয্যাত্যাগ করে কুণ্ডু স্পেশালের 'বিশ্বস্ত বার্তাবহের' কাছে শুনতে পেলাম পদব্রজের যাত্রী শেষ রাত থেকে যেতে শুরু করেছে ; সকাল নটার পর শেষ ডাণ্ডি যেতে দেবে অমরনাথের পথে। পঞ্চতরণী থেকে সাড়ে চার মাইল পথ। আগে ছিল মাত্র দুই মাইল। সে পথ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমান রাস্তার নাম 'সন্তসিংহের রাস্তা'— 'সন্তসিংকা রাস্তা'। প্রথম দু মাইল সমতলভূমি, তারপর দু মাইল চড়াই। খাড়া চড়াই। বিপজ্জনক চড়াই। তারপর গ্লেসিয়ার অর্থাৎ জমাট বরফের উপর দিয়ে যেতে হবে অমরাবতী নদীর ধারে ধারে। অমরাবতী নদীর উদ্ভব হয়েছিল নাকি পুরাকালে অমরতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় প্রাণীগণের কাতর প্রার্থনায় বিগলিত হয়ে দেবাদিদেব শিবের আপন জটা-নিঙড়ে-ফেলা জলে। অমরনাথ গুহার ঠিক নীচেই প্রবাহিতা অমরাবতী নদী। তীব্র স্রোত আর রক্ত জমানো ঠাণ্ডা তার জল। তাতে ভক্তযাত্রী অবগাহন করে অমরনাথ দর্শনে যান। স্নানের জায়গা ঘিরে রাখা আছে। স্নানান্তে গুহাগাত্র থেকে চেঁছে নেওয়া একপ্রকার খড়ির গুঁড়া বা বিভূতি সংগ্রহ করা থাকে তাই গায়ে মেখে নেন। তাতে নাকি শীতবোধ তিরোহিত হয়। আমরা ওসব কিছুই করতে পারিনি ; তবে স্নানরত পুণ্যার্থী নর-নারীর দর্শনলাভের সৌভাগ্য হয়েছিল।

পঞ্চতরণী বা পঞ্চতরঙ্গিণী সম্বন্ধেও কাহিনী আছে। এটাও নাকি মহাদেবের জটা। আর পাশে থাকা পাহাড় নাকি অভিশাপগ্রস্ত রুদ্রগণ। প্রতি সন্ধ্যায় ডমরু বাজনোর ভার দেওয়া ছিল তাঁদের উপর। একদিন সন্ধ্যায় ডমরু বাজানো হয়নি। তাতে নাকি মহাদেব রুষ্ট হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন, পাথর হয়ে যাও। রুদ্রগণ পাহাড়ে পরিণত হলেন। ঐ পাহাড়ের নাম হ'ল ভৈরব-ভাল। চলতি কথায় ভৈরব-ঘাট। ঐ পাহাড়ের পরে আর এক পাহাড়ে এক অতীব সঙ্কীর্ণ পথ আছে, যার নাম 'গর্ভ-যাত্রা'। ঐ স্থানের নাম 'গর্ভাগার'। কথিত আছে শিবের দর্শনপ্রার্থী জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন দ্বাররক্ষক নন্দী। নন্দী তখন প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যে ওই প্রস্তরখণ্ডে ছিদ্র করে মাত্র একজনের প্রবেশ উপযোগী পথ রাখা হোক

যাত্রাপথের-বাঁকে। তাহলে একসঙ্গে একের অধিক লোক যেতে পারবে না ঐখান থেকে। জনতা হবে নিয়ন্ত্রিত। পরে দেখলাম সেই স্থানের পথ সত্যিই গর্ভাগার। একান্ত অপ্রশস্ত, অতীব সঙ্কীর্ণ। বসে অতিকষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে পার হতে হয়। কুমায়ুন রেজিমেণ্টের সৈন্য দুপাশে মোতায়েন রয়েছে দেখলাম, সকলকে হাত ধরে পার করে দিতে। ঐ বাঁকের ডানদিকে উচ্চ পর্ব্বতগাত্র, বামদিকে অতলস্পর্শী খাদ। আধ হাত আন্দাজ প্রশস্ত সেই বাঁকের মুখ। তীর্থযাত্রীর একাগ্রতার এই বোধ হয় শেষ পরীক্ষা-স্থল।

॥ অমরনাথ ॥

যাক্, এসব পরের কথা। এখন, ২৩শে আগস্ট সকাল নটায় আমরা পঞ্চতরণী থেকে অমরনাথ গুহা অভিমুখে রওনা হলাম। সামনে একটু গিয়েই দেখি অবিচ্ছিন্ন ধারায় জনস্রোত চলেছে। সব পদব্রজে। মাইলখানেক গিয়ে দেখা গেল ডাণ্ডীতে যাওয়া অসম্ভব। সারি সারি ডাণ্ডী পাহাড়ের গায়ে পথের পাশে নামানো রয়েছে। প্রহরারত পুলিস তাদের ছাড়েনি। যাত্রীদের যেতে হচ্ছে নেমে হেঁটে এগিয়ে। নিরুপায়। পথ উঠে গিয়েছে ঘুরে ঘুরে উর্দ্ধ-দিকে। একটু হাঁটলেই বুকের ভিতর তোলপাড় করতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রবল প্রতিবাদ। ভৈরব-ঘাট পর্যন্ত খাড়া চড়াই। এ পথের দুর্গমতা বর্ণনা করে বোঝানো যায় না। কিন্তু যেতেই হবে। ভৈরব-ঘাটের উচ্চতা ১৩,২০০ ফিট। অতীব সঙ্কীর্ণ পথ। মাঝে মাঝে দেখি পাহাড়ের পার্শ্বদেশ ধ্বসে পড়ে গিয়েছে। নীচের দিকে তাকানো যায় না; মাথা ঘুরে যায়। মনে হয় নীচে থেকে কিসের একটা প্রবল আকর্ষণ রয়েছে, যার টানে ঐ বিরাট পাহাড় থেকে ধ্বস্ নেমেছে বহুস্থানে, আমাদেরও যেন ডাকছে, ঝাঁপিয়ে পড়তে।

চলেছি পদব্রজে। একটু যাই, আবার বসে পড়ি ডানদিক চেপে পাহাড়ের গায়ে। আমাদের ডাণ্ডী, ডুলি সব পড়ে থাকলো পথের পাশে। বলে এলাম যদি পরে রাস্তা খোলা পায় তাহলে যেন গুহা পর্যন্ত আসে। সে কথা শুনে বিকেলের দিকে গিয়েছিল দুটো ডাণ্ডী ও একটা ডুলি। বাকী দুটো ডুলি ইচ্ছা করে যায়নি। তার ফলে অমরনাথ দর্শনের পর ফেরার পথে অত্যন্ত কষ্ট করে হেঁটে আসতে হয়েছিল দুজনকে, আমার কন্যার বড়জা শান্তি আর

আমার সহধর্মিণী অমলা দেবীকে। সে পরে ফেরবার সময়ের কথা। এখন যাবার সময় সকলেই অসীম সাহসে, মনের জোরে এগিয়ে গেলেন ; আমি যেন আর কিছুতেই চলতে পারছিলাম না। সহধর্মিণী সঙ্গেই ছিলেন। তিনি জানেন ডাক্তারের নিষেধ।

আমার পক্ষে কোনও উচুঁ জায়গায় ওঠা নিষেধ। তাতে নাকি হৃৎপিণ্ড হঠাৎ জবাব দিয়ে থেমে যেতে পারে। বুকের ভিতর যখন তোলপাড় করতে থাকে একটু বেশীমাত্রায়, তখন বসে পড়ি। কিছুক্ষণ জিরিয়ে আবার চলি। এমনি করে একটা সুঁচলোমুখ লাঠিতে ভর দিয়ে যাচ্ছিলাম। লোহা-বাঁধানো সুঁচলোমুখ লম্বা লাঠি সকলের হাতেই ছিল। অপরিহার্য সহায়। কিছু পথ গিয়ে দেখি এক তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছরের পাঞ্জাবী মেয়ে পথের পাশে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আছেন, উপায়-বিহীন উদ্বিগ্ন মুখে এক পুরুষ, সম্ভবতঃ মেয়েটির স্বামী, একপাশে উপবিষ্ট ; দুজন সশস্ত্র পুলিস সেখানে বসে পড়ে একজন মেয়েটির পায়ের জুতা-মোজা খুলে ফেলে পায়ের তলায় হাত দিয়ে জোরে জোরে ঘষছে, অপরজন মেয়েটির হাতের তেলো ঘষছে। উত্তাপ সঞ্চারের জন্য। আমরা তার কাছে দাঁড়িয়ে পড়লাম। শুনলাম এঁরা অমরনাথ দর্শন করে ফিরে আসছিলেন। পথশ্রমে ও ঠাণ্ডায় মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। অথচ চেহারায় দুর্বল ক্ষীণপ্রাণ মনে হ'ল না। সামনে থেকে জনকয়েক কুড়ি-একুশ বছর বয়সের কাশ্মীরী বা পাঞ্জাবী মেয়ে এসে পৌছল। তারাও দাঁড়িয়ে গেল। সুন্দর স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ দেহ তাদের। একজন তার ঢিলে জামার ভিতর থেকে চ্যাপ্টা ব্র্যাণ্ডির শিশি বার করলো, ঢাকনি খুলে তাতেই ব্র্যাণ্ডি ঢেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা মেয়েটিকে খাওয়াতে চেষ্টা করলো। কিন্তু দাঁত লেগে রয়েছে, মুখ খুলতে পারা গেল না। তার পাশে বসে থাকা পুরুষকে বললাম, মেয়েটির নাক টিপে ধরতে, তাহলেই দাঁত খুলে যাবে, আর মুখ হাঁ হবে। সে লোকটি রাজী হল না, আমাকে জিজ্ঞাসা করলো আমি ডাক্তার কিনা। যাই হোক, একটু পরে মেয়েটির দাঁত ছেড়ে গেল। অল্প অল্প ব্র্যাণ্ডি তার মুখে দেওয়া হ'ল। কিছু পরে মেয়েটি চোখ মেলে চাইলো। যাক, সামলে গেল মনে করে আমরা নিজেদের যাত্রাপথে অগ্রসর হলাম।

মাইলখানেক ধীরে ধীরে চড়াইপথে উঠে এলাম বিশ্রাম করতে করতে। তারপর শুরু হ'ল উৎরাই। তারপরে প্রায় দু মাইল জমাট বরফ। গ্লেসিয়ার। অমরাবতী নদী বয়ে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। স্বচ্ছ নীলাভ তার সলিলধারা। মাঝে

মাঝে আবৃত হয়ে আছে পুঞ্জীভূত বরফে। একস্থানে দেখি খিলানের আকারে এক বিরাট বরফের চাপ নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে রয়েছে এপার থেকে ওপার পর্যন্ত। কী আশ্চর্য দৃশ্য! বরফের সেতু। আমাদের যেতে হচ্ছিল সুচালো লৌহমুখ লাঠি বরফের উপর ঠুকতে ঠুকতে। শোনা আছে, হালকা ফাঁকা বরফে পা পড়লে পা ডুবে যায়, শুধু পা নয়, গোটা মানুষই তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাই পথ ঠিক করে চলা দরকার। সে তো সর্বত্রই।

বিপথে বিপদ আছে। কিন্তু আমার বিপদ এল অন্যদিক থেকে। ঠাণ্ডায় নয়, ক্লান্তিতে আমার পা অবশ হয়ে ভেঙে পড়ার উপক্রম হ'ল। মনে হ'ল আর এক পাও যেতে পারছি না। বসে পড়ি এই তুষারক্ষেত্রে। নিষেধ করলেন সহধর্মিণী। বললেন, বসলে আর উঠতে পারবে না এখান থেকে। বললেন, ঐ দেখ গুহা দেখা যাচ্ছে, এই তো আমরা পৌছে গিয়েছি, আস্তে আস্তে এইটুকু চলো, না হয় আমার কাঁধে হাত রেখে চলো।

তখন কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকারও শক্তি ছিল না শরীরে। তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে গেলাম। সহসা পিছন থেকে ঠক্ ঠক্ আওয়াজ পেয়ে ফিরে দেখি, এক কটি-বস্ত্র সম্বল বৈরাগী লাঠি ঠুকে ঠুকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর ডান পা সরু হয়ে শুকিয়ে বেঁকে উঁচু হয়ে রয়েছে, মাটি স্পর্শ করে না, চলেছেন বাঁ পায়ে আর ডান বগলে চেপে রাখা একটা বাঁশের ক্রাচে ভর দিয়ে! কটি-বস্ত্র ছাড়া তাঁর সারাদেহ অনাবৃত। না আছে শীত-বোধ, না আছে ক্লান্তি-বোধ।

তাঁকে দেখিয়ে সহধর্মিণী একটু জোর দিয়ে বললেন, ঐ বৈরাগী একপায়ে এগিয়ে গেলেন, আর তুমি দুই পায়ে যেতে পারবে না? নিশ্চয় পারবে। চল, আমার কাঁধে হাতের ভর দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চল। যেতে পারবে না মানে? খুব যেতে পারবে।

পারলাম যেতে। যাঁর কৃপায় পঙ্গু ও খঞ্জ গিরি লঙ্ঘনের শক্তি পায় সেই পরমানন্দ মাধবকে স্মরণ করে, আর মনে মনে গুরুচরণে প্রণাম নিবেদন করে চলতে শুরু করলাম। চলা বলে চলা। একেবারে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট একভাবে গিয়ে গুহার নিম্নভাগে পর্বতমূলে উপনীত হলাম। কী বিরাট উত্তুঙ্গ এই পর্বত। ১৬।১৭ হাজার ফিট উঁচু এই পাহাড়ের চূড়া। এরই মধ্যস্থলে এক বিশাল প্রাকৃতিক গুহা, যার ভিতর হিমলিঙ্গ অমরনাথ আর মাতা পার্বতী ও গণেশ নামধারী বরফ-স্তূপ। স্বাভাবিক প্রস্তর বেদীতে এঁদের উদ্ভব ও প্রকাশ। গুহামুখ পর্যন্ত অবিন্যস্ত প্রস্তরখণ্ডে পা দিয়ে উঠতে হবে।

যারপরনাই কষ্টসাধ্য। বসে বসে গেলাম সেই পথ ধরে অগ্রগামী যাত্রীদের অনুসরণ করে। অবশেষে দেখি পৌঁছে গেছি গুহার সম্মুখে। বিরাট গুহা। দৈর্ঘ্যে ১৫০ ফিট, প্রস্থে ৫৫ ফিট, আর উচ্চতায় ৪৫ ফিট। দক্ষিণমুখী গুহা। মহাকাল যেন বদন ব্যাদান করে রয়েছেন। "গ্রসমানঃ সমন্তাৎ"। দুর্নিবার আকর্ষণে চলেছে দলে দলে নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবা; চলেছে স্তন্যপায়ী শিশুকোলে তরুণী মাতা, চলেছে জরাগ্রস্তা, কোমর-ভাঙা বৃদ্ধা। কী আছে ঐ গুহার ভিতরে? কিসের আকর্ষণে চলেছে এই জনতা বাহ্যজ্ঞানহীন উন্মাদের মত?

১২৭৩০ ফিট উঁচুতে অবস্থিত এই গুহা। কৃত্রিম নয়, স্বাভাবিক গুহা। মানুষ শুধু আবিষ্কার করেছে এখানে স্বয়ম্ভু তুষার-লিঙ্গকে। গুহার ছাদে এক বিশেষ ফাটল দিয়ে ঝরে পড়ে বিন্দু বিন্দু জলধারা নীচে থাকা প্রস্তর বেদীর উপর। বরফে রূপান্তরিত হয় সেই ঝরে পড়া জল। শিবলিঙ্গের আকারে বর্ধিত হতে থাকে, পূর্ণিমায় তার উচ্চতা হয় প্রায় চার ফুট পর্যন্ত। এই রহস্যের সমাধানে বস্তু-বিজ্ঞান অক্ষমতা স্বীকার করেছে।

গুহায় প্রবেশ করে দেখি দুই প্রান্তে দুপ্রস্থ কাষ্ঠনির্মিত সোপান। একদিক দিয়ে বেদীর উপর যাওয়া, অন্যদিক থেকে নেমে আসার জন্য। সোপান আট-দশ ধাপের বেশী নয়। উঠে গেলাম বেদীর উপর। দেখলাম স্বচ্ছস্ফটিক সদৃশ বরফের শিবলিঙ্গ। উচ্চতা কমে গিয়েছে শুনলাম। আমরা যখন দেখতে পেলাম তখন মধ্যাহ্ন অতীত। প্রায় দুটো তখন। তথাপি সেই বিরাট অলৌকিকের সম্মুখে স্তব্ধ বিস্ময়ে দণ্ডায়মান থাকতে হ'ল। দুইপাশে আরও দুই খণ্ড বরফের স্তূপ। নাম পার্বতী ও গণেশ। শিবলিঙ্গের দুপাশে রয়েছে শ্রীনগর থেকে শোভাযাত্রা সহকারে আনা রূপার দণ্ড বা ছড়ি। রয়েছে অমরনাথের পতাকা। উপবিষ্ট রয়েছেন মোহন্ত মহারাজ ও পূজারী। পূজারী গ্রহণ করছেন যাত্রীপ্রদত্ত পূজার উপকরণ। নূতন বস্ত্র, বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা কিসমিস, আখরোট প্রভৃতি মেওয়া, মিছরী, কালোমরিচ, কর্পূর, চিনি, নারিকেল প্রভৃতি। তদ্ভিন্ন অনেকে এনেছেন ও দিলেন রৌপ্যনির্মিত ত্রিশূল, ফণাধারী সাপ। গুহার গাত্রদেশ থেকে সাদা খড়িমাটির মত বিভূতি চেঁছে নিয়ে পূজারী যাত্রীদের কপালে লেপন করছিলেন। কেউ কেউ ঐ বিভূতি কাগজে মুড়ে সঙ্গে নিলেন। বাড়ি ফিরে গিয়ে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে দেবার জন্য। সকলে সুখী হোক, সকলে নিরাময় হোক, এই না আমাদের কাম্য।

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। এই তো আমাদের উদার ধর্মের মূল নীতি।

কয়েকজন নাগা সন্ন্যাসীকে একপাশে এক অগ্নিকুণ্ডের ধারে হোম করতে দেখা গেল। যাত্রীর আনাগোনার বিরাম নেই। দর্শনান্তে বেদী থেকে নেমে প্রশস্ত চত্বরে অনেকে বসে বিশ্রাম করছেন। তবুও চারিদিকে একটা অবর্ণনীয় শান্ত সমাহিত ভাব। সেই ভাবের ভিতরেই দেবতা বিদ্যমান। ভাবে হি বিদ্যতে দেবঃ।

কিছুক্ষণ আমরাও শান্তমনে নীরবে সেখানে বসে ভাবগ্রহণে যত্নশীল হলাম। ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী শিবসুন্দরের প্রভাব অন্তরে অনুভব করতে সচেষ্ট হলাম। তিনি তো সর্বব্যাপী। আমার অন্তরেও তিনি অধিষ্ঠিত। তাঁর সেই অধিষ্ঠানকে আড়াল করে রাখে কৃত্রিম কর্মপ্রবাহ। অন্তরের বস্তু বাইরে দূরে সরে যায়। ভুলে যাই তাঁর অস্তিত্ব, ভুলে যাই নিজের স্বরূপ। এই সকল দুর্গম তীর্থের পথ অতিক্রম করার জন্য যে একাগ্রতার প্রয়োজন, সেই একাগ্রতা মনোমন্দিরের রুদ্ধ কবাট খুলে দেয়, মনের সিংহাসনে চিরবিরাজিত দেবতার অস্তিত্ব তখন উপলব্ধ হয়। তীর্থযাত্রার আবশ্যকতা সেই জন্যই। তদ্ভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর প্রভাবে মনের মালিন্য দূরীভূত হয়। স্বচ্ছ নির্মল হয় মনের মুকুর। অন্তরস্থিত দেবতা সহজেই তখন প্রতিফলিত হন তাতে। তাই বলা হয়ঃ

> ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবঃ ন শিলায়াং কদাচন
> ভাবে হি বিদ্যতে দেবঃ তস্মাৎ ভাবং সমাচরেৎ।

গুহার চত্বরে উপবিষ্ট হয়ে অনুভূতির সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। সাময়িক হলেও তা প্রভূত মূল্যবান। দু-একজন পাণ্ডা দেখি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমাদের হাতে রাখী বেঁধে দিলেন, কপালে বিভূতি লেপন করলেন। শুভইচ্ছা জানালেন প্রচুর। কাজেই দিলাম কিছু দক্ষিণা। যা দিলাম তাতেই সন্তুষ্ট হলেন। সকলেই কিছু কিছু দেন বোধ হয়। দেবেন না কেন? কত দিকে কত খরচ হচ্ছে। এঁদের হাতও তো ভগবানের হাত। এঁদের তৃপ্তিতে ভগবৎ-তৃপ্তি।

যাক, অবশেষে সম্ভব হ'ল, এবং সম্পন্ন হ'ল দুর্গম পথের শেষে দুর্লভ দেবদর্শন। তৃপ্তি ও মানসিক শান্তিতে অন্তর পরিপূর্ণ হ'ল। শারীরিক সকল কষ্টের ক্ষতিপূরণ হয়ে গেল সার্থকতার অনুভূতিতে। কিন্তু ঠিক কী যে দেখলাম তা অপরকে বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। দেখে কি শুধু এই দুটি চোখে?

তা তো নয়। দেখে মন। একই বস্তু বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন মনোভাব নিয়ে বিভিন্ন রূপে দেখে।

গুহার বাইরে এসে চারিদিকে চেয়ে অনুসন্ধান করতে লাগলাম, কোথায় সেই কাহিনী-শ্রুত যুগ্মপারাবত। দেখতে পেলাম গুহার বাইরে পাহাড়ের গায়ে। এঁরা নাকি হর-পার্বতী, পারাবত-দম্পতি রূপে এই গুহায় বিরাজমান। লোকালয়ের সম্পর্ক-বিরহিত ঐ উচ্চ পর্বতে সারা বছর এঁরা কি আহার করে থাকেন? প্রচণ্ড শীতেই বা থাকেন কি করে? কেউ জানে না, কেউ বলতে পারে না। কিন্তু প্রতি বছর শ্রাবণী পূর্ণিমায় যাত্রীদল দেখতে পান এ পারাবত দম্পতিকে। একজন অবিশ্বাসী-মন ব্যক্তি বলেছিলেন দণ্ড-ধারী মোহন্ত মহারাজের সঙ্গে কেউ লুকিয়ে প্রতি বছর একজোড়া পায়রা এনে যাত্রী-সমাগমের পূর্বে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তাতে তাঁদের কী লাভ হয়? কিছুই নয়। পাহাড়ের গুহায় ছাদের ফাটল দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল কোথা থেকে আসছে, কী কারণে ঠিক ঐ নীচে প্রস্তর বেদীর উপর সেই জলবিন্দু পতিত হয়ে বরফে পরিণত হয়, সেই বরফ অবিকল শিবলিঙ্গের আকারে কী উপায়ে বর্ধিত হয়, (চার ফুট পর্যন্ত উঁচু হয় ঐ বরফের স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ) এ সমস্যার তো সমাধান এ পর্যন্ত কেউই করতে পারেননি।

বিশ্বাস করলেই অন্তরে উপজাত হয় অজেয় শক্তি। সংশয় বা সন্দেহ আনে আত্মবিনাশের সহায়ক দুর্বলতা। দুর্বলতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মৃত্যু। আত্মজ্ঞান অমরত্ব লাভের সোপান। সেই আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত থাকে দুর্বল-চিত্ত সংশয়াচ্ছন্ন লোক। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

॥ অবতরণ ॥

শ্রীশ্রীঅমরনাথের উদ্দেশে শেষ প্রণাম নিবেদন করে আমরা নামতে শুরু করলাম। বিস্মিত হলাম দেখে যে সেখানেও কুণ্ডু স্পেশালের পরিচারকবর্গ আমাদের সকলের জন্য গরম চা, লুচি, আলুর তরকারি ও মিহিদানা প্রস্তুত করে হাতে হাতে ধরে দিল। ক্ষিদের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু খেতে পেয়ে খুবই তৃপ্তি হ'ল। সেইখানে পাথরের উপর বসা অবস্থায় আমাদের একটা ফটো তুললেন শ্রীমতী রমলা ঘোষ। পিছনে দূরে গুহা দেখা যাচ্ছে তাতে।

এইবার প্রত্যাবর্তনের পালা। আমার ডাণ্ডী এসে গিয়েছে। কন্যা অঞ্জলির ডাণ্ডীও। বিকেল সাড়ে তিনটেয় আমরা রওনা হলাম ফেরার পথে। একটা মাত্র ডুলি এসেছিল। শাশুড়ী ঠাকুরাণীর। আর দুটি ডুলির দেখা নেই। ভাবলাম তারাও হয়ত আসছে, এগিয়ে গেলে দেখতে পাব। কুণ্ডু স্পেশালের দায়িত্বশীল শ্যামাপদকে বলে এলাম, যাঁদের ডুলি তখনও পৌছয়নি তাঁদের যেন সঙ্গে করে নিয়ে আসে এবং যথাসম্ভব সহায়তা করে।

অপেক্ষা করে লাভ নেই ভেবে আমরা অপরাপর যাত্রীদলের সঙ্গে ফিরতে শুরু করলাম। কিন্তু পথে বাকী ডুলি দুটির দেখা পেলাম না। বুঝলাম, তারা ইচ্ছা করেই গেল না গুহা পর্যন্ত। কর্তব্যজ্ঞান তো সকলের সমান নয়। কিছু দূর এসে দেখি দলে দলে যাত্রীদল পথে দণ্ডায়মান অথবা পথপার্শ্বে উপবিষ্ট। গর্ভাগারের সঙ্কীর্ণ পথে একের অধিক লোক যেতে পারে না। সেখানে হাত ধরে ধরে পুলিস ও সৈন্য এক-একজন যাত্রীকে পার করে দিচ্ছে। সময় লাগছে তাতে। প্রায় দু ঘণ্টা সেখানে অপেক্ষা করে থাকতে হ'ল। তা হোক্। উপায় নেই আর কিছু করার। ঐ একটিমাত্র পথ। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমাদের দলের আমিই সর্বপ্রথম পঞ্চতরণীতে আমাদের তাঁবুতে ফিরে এলাম। খুবই ক্লান্ত তখন। তাঁবুতে ঢুকেই বসে পড়লাম। শ্যামবাজারের কীর্তি মিত্র লেনের কল্যাণীয়া গৌরীরাণী মিত্র কন্যার মত এগিয়ে এসে আমার বিছানাটা বিছিয়ে দিলেন; নিজের দামী শাল আমাকে দিলেন গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বসতে। তখন বেশ জোরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। অল্পপরেই কন্যা অঞ্জলি এসে পৌছল। তারপর তার মাতামহী। তার মাতা ও বড়জা এলেন বে: খানিক পরে।

আমাদের তাঁবুতে সহযাত্রী শ্রীমতী রমলা ঘোষ এলেন সব শেষে। তখন রাত্রি নটা। তিনি ক্লান্তিতে অবসন্ন। সেদিন রাত্রে কিছু খেয়েছিলাম কিনা বা কিভাবে শয়ন করলাম কিছুই মনে পড়ে না।

পরদিন ২৪শে আগস্ট খুব ভোরে উঠে বাইরে এলাম। তীর্থযাত্রার সাফল্যে মন পরিপূর্ণ। তিনদিন পরে ঈষদুষ্ণ জলে বেশ করে মাথা ধুয়ে জবাকুসুম তেল মাথায় মাখলাম। গত তিনদিন সুযোগ হয়নি। অদ্ভুত দক্ষতায় কুণ্ডু স্পেশালের পরিচারকবৃন্দ নটার মধ্যে আমাদের ভাত খাইয়ে দিল। নটায় পঞ্চতরণী থেকে শুরু হল প্রত্যাবর্তন। মহাগুণা পাশ পেরিয়ে এলাম এগারটায়। বেশ ঠাণ্ডা বোধ হ'ল। শেষনাগ হ্রদের পাশে বায়ুজানে এলাম সাড়ে বারোটায়। সেখানে

কিছু সঙ্গে থাকা মেওয়া এবং দোকান থেকে গরম চা ও বিস্কুট খাওয়া হ'ল। একটায় পুনরায় রওনা হয়ে পিশুঘাঁটির উপরে পৌছলাম বিকেল তিনটায়। খুব বাহাদুরি এই ডাণ্ডীবাহকদের। বড় গরীব এরা। পথে চা ও বিস্কুট খেতে পৃথক টাকা দেওয়ার জন্য খুব খুশী। নিজেদের মাথার অত্যন্ত নোংরা গোল কাপড়ের টুপিতে জল ধরে নিয়ে পিপাসা দূর করছিল ঝরনার জল খেয়ে। পথে বরফ ভেঙে নিয়ে মুখে দিচ্ছিল। অক্লান্তভাবে একভাবে চোদ্দ-পনেরো মাইল আমাদের বয়ে নিয়ে এসে পৌঁছে দিল চন্দনবাড়িতে। তখন বিকেল পাঁচটা। ততক্ষণে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। চন্দনবাড়িতে তাঁবুর ভিতর সেদিন আমরা রাত্রিবাস করলাম। আরও অনেকে থাকলেন চন্দনবাড়িতে। আবার অনেকে সোজা ফিরে গেলেন পহলগাঁও-এ, হোটেলের আরামপ্রদ আশ্রয়ের লোভে।

স্বপ্না থেকে গেল আমাদের সঙ্গে, আমাদের তাঁবুতে। সেদিন রাত্রে গরম গরম ভাত, মুগের ডাল ও আলুর তরকারি খুবই উপাদেয় মনে হয়েছিল। আমাদের ডাণ্ডী ও ডুলিবাহকরা অবশ্য বারম্বার বলেছিল পহলগাঁও-এ সেই সন্ধ্যায় ফিরে যাবার জন্য। সেখানে ফিরে গেলেই তাদের ছুটি হবে; টাকাকড়ি বুঝে নিয়ে যে যার ঘর চলে যাবে।

পরদিন ২৫শে আগস্ট মঙ্গলবার বেলা এগারোটায় ফিরে এলাম পহলগাঁও-এ। পথে প্রত্যাবর্তন-অধীর জনতার চাপে অথবা নিজেদের অসতর্কতার জন্য দুবার কন্যা অঞ্জলিকে তার ডাণ্ডীবাহকরা ফেলে দিয়েছিল। একবার পথপার্শ্বে গভীর খাদের ঢালুতে একটা গাছের গুঁড়িতে আটকে গিয়ে বেঁচে গিয়েছিল আমার কন্যা। হাত-পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। আমার ডাণ্ডীকে বলেছিলাম ওদের ডুলি ও ডাণ্ডীর ঠিক পিছনে-পিছনে আসতে। নইলে আমার ডাণ্ডীবাহকের সর্দার মামুদ পাঠান খুব দ্রুতগতি, এবং সকলের আগে আমাকে বরাবর নিয়ে গিয়েছে, নিয়ে এসেছে। সাবধানী ও ভদ্রপ্রকৃতির। কন্যার ডাণ্ডীবাহকদের সর্দার মীর রহিম দেখলাম তা নয়। অত্যন্ত অসাবধানী। কী আর করবো? সকলে তো সমান হয় না। ঐ পথে ওদেরই হাতে জীবন সমর্পণ করে যেতে হয়েছে। কিছু বলা চলে না সেখানে। পহলগাঁও-এ ফিরে এসে মীর রহিমের পরিচয়পত্রে লিখে দিলাম—অত্যন্ত অসাবধানী।

ঐদিন সকলে বিশ্রাম করলাম পহলগাঁও-এ। অতি মনোরম পার্বত্য শহর। একটি তিনতলা বিরাট কাঠের বাড়িতে Tourists' Reception Center। তাছাড়া অগণিত আরামদায়ক হোটেল আছে। আছে নয়ন-মুগ্ধ-

কর ফুলের বাগান। এক গুজরাটি হোটেল দেখলাম, নাম 'পূর্ণিমা'। ভিতরে গেলাম। সুন্দর ব্যবস্থা। নামের সার্থকতা আছে। একটা পুরাতন খালসা হোটেল দেখলাম—১৯২৮ সালে স্থাপিত। ঐ নামে আরও একটা হোটেল পাশেই রয়েছে—১৯৩৮ সালে স্থাপিত। তারপর প্লাজা, নিউ অশোকা প্রভৃতি হোটেল অর্থশালী পর্যটকদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে রেখেছে। আমরা মধ্যবিত্ত হোটেল গলফ-ভিউতে স্থান পেয়েছিলাম।

২৬শে আগস্ট স্নানাহারের পর রিজার্ভড্ বাস্-এ পহলগাঁও থেকে প্রত্যাবর্তন শুরু হ'ল। সেদিন সন্ধ্যায় 'কুডে' পৌঁছে রাত্রিবাস করতে হ'ল সেখানকার একটা ইয়ুথ হোস্টেলে। এবার আর সরকারী বাংলো জুটলো না আমাদের ভাগ্যে। অন্য একদলকে এবার কুণ্ডু স্পেশালের কর্তৃপক্ষ সেখানে আরামপ্রদ অবস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। বলবার কিছু নেই। ইয়ুথ হোস্টেল একটা উঁচু টিলার উপরে অবস্থিত। জলের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেজন্য খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল আমাদের। 'কুডে' আসার পথে 'খানাবল', 'অনন্ত-নাগ', 'কাজী-গুণ্ড', জহর টানেল অতিক্রম করে 'বানিহাল' 'রামবাঁধ' বা 'রাম-বান', 'বাটোট' প্রভৃতির পাশ দিয়ে আসতে হয়েছিল। এবার জহর টানেল অতিক্রম করতে মাত্র ছয় মিনিট লেগেছিল।

২৭শে আগস্ট খুব ভোরে উঠে বাইরে এলাম। অতি মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য, সূর্যোদয়ের পূর্বে দিগন্ত-বিস্তৃত উষাকালীন লাল-আভা, দূরে পর্বত-মালার গায়ে ঘুমন্ত মেঘ মনে এক অপার্থিব আনন্দের সঞ্চার করেছিল। অল্পক্ষণ পরেই চা জলখাবার খেয়ে অপেক্ষমাণ বাস্-এ যাত্রা শুরু হ'ল—সেই অমর্ত্য-লোক থেকে সমতলের দিকে।

॥ ঘরে ফেরা ॥

বেলা প্রায় এগারটায় পৌঁছলাম জম্মুতে এয়ার লাইনস্ কম্পাউণ্ডের বিস্তৃত ভূখণ্ডে। সেখানে লুচি, আলুর তরকারি ও মিষ্টি কাগজের বাক্সে আমাদের হাতে হাতে দেওয়া হ'ল। মধ্যাহ্ন-আহার। পাঠানকোটে এসে পৌঁছলাম বিকেল সাড়ে তিনটায়। সেখানে স্টেশনের সাইডিং-এ রাখা আমাদের ট্যুরিস্ট কোচে এসে বেশ করে স্নান করলাম স্নানের ঘরে ঢুকে। বেশ গরম এখানে। স্নান করে শরীর ঠাণ্ডা হ'ল। সমাপ্ত হ'ল তুষারতীর্থ অমরনাথ

যাত্রা। সেইদিনই রাত্রে শ্রীনগর এক্সপ্রেসে সংযুক্ত হ'ল আমাদের 'কুণ্ডু স্পেশাল' গাড়ি। রাত্রি ৯-৫০ মিনিটে পাঠানকোট থেকে ছেড়ে পরদিন সকালে দিল্লী।

২৮ তারিখে দিল্লী থেকে রাত্রি বারোটার একটা ট্রেনে সংযুক্ত হয়ে পরদিন ২৯শে আগস্ট সকালে মথুরা জংশন পার হয়ে আমাদের গাড়ি আগ্রা ক্যাণ্টনমেণ্টে এসে দুদিন সেখানে থাকলো। সেখান থেকে আমরা গেলাম মথুরা, বৃন্দাবন। মথুরায় বড় ডাকঘরের পিছনে আছে 'সারদা-সদন'। শ্রীমুকুটবিহারী লালের গৃহ। তাঁর কন্যা সারদার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ১৯৬৩ সালে হরিদ্বারে বাটালা-ভবনে। মেয়েটি বড় ভাল। তার স্বামী ইঞ্জিনীয়ার। এখন ট্রেনিংয়ের জন্য বিদেশে (বোধ হয় রাশিয়ায়) রয়েছে। ঐ মেয়েটি হরিদ্বারে থাকার সময় তার পিতৃগৃহের ঠিকানা দিয়ে বারম্বার বলেছিল সুযোগ ও সুবিধামত সেখানে যেতে। এবার এই সুযোগে গিয়েছিলাম আমরা। কী আনন্দ তাদের! তাদের সঙ্গে দেখা করে টাঙ্গায় করে আমরা গিয়েছিলাম বৃন্দাবনধামে। ফিরবার সময় মথুরায় এসে শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি দেখে সারদা সদনে ফিরে এসেছিলাম। সেখানে কিছুক্ষণ আলাপ করে ও ঘরে প্রস্তুত খাবার ও চা খেয়ে আমরা পরম তৃপ্তি লাভ করেছিলাম। মুকুটবিহারী লাল বিপত্নীক। অতি অমায়িক রুচিবান ভদ্রলোক। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর ছেলে মেয়ে সব খুব ভাল।

সকালে প্রথমেই দর্শন করলাম বাঁকেবিহারীজীকে। তাঁর মন্দির বন্ধ হয়ে যায় সকাল দশটায়। পুরানো গোবিন্দজীর মন্দিরে প্রাচীন ভক্ত সাধু ভগবানদাস মোহন্তকে এবার দেখলাম সুস্থ আছেন। তাঁর নির্দেশে গোবিন্দজীর দর্শন পূজা বেশ ভাল ভাবেই হ'ল। বিরাট লাল পাথরের মন্দির। মানসিংহ নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন রূপ গোস্বামীর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী। খুব উঁচু ছিল। মন্দিরের মাথায় রোজ সন্ধ্যায় বাতি জ্বলতো। দিল্লীতে আপন প্রাসাদে বসে বাদশা ঔরঙ্গজেব নাকি তা দেখতে পেয়ে ক্রুদ্ধ হন, আদেশ দেন মন্দির ভেঙে সব লুট করতে। অপরাধ? হিন্দুর মন্দিরের আলো সম্রাটের প্রাসাদের চেয়েও উঁচুতে জ্বলবে? অসম্ভব। জয়পুরের হিন্দু রাজাও নাকি সেই রাত্রে স্বপ্নাদেশ পান—যেন গোবিন্দজী বলছেন—"আমাকে নিয়ে এসো, মন্দির ভাঙতে আসছে।" জয়পুরের হিন্দু রাজা তৎক্ষণাৎ নাকি লোক পাঠিয়ে গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন তিন বিগ্রহকেই জয়পুরে নিয়ে যান ও পৃথক মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা তদবধি সেখানেই আছেন।

বৃন্দাবন রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি। তার নিধুবন, কেলিকদম্ব, চীরঘাট, তার অগণিত মন্দির প্রভৃতির বর্ণনার স্থান এই ভ্রমণকাহিনীর সীমাবদ্ধ পরিধিতে নেই। দেখেও শেষ করা যায় না, বলেও বোঝানো যায় না।

রঙ্গনাথের মন্দির, শাহজীর মন্দির, সমাজবাড়ি, ইমলিতলা প্রভৃতি আবার দেখলাম। নিধুবনও দেখে এলাম। ফিরবার পথে এক জায়গায় ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখতে পেলাম। আর দেখলাম এই আজকের দিনের উন্নত দ্রুতগামী যান্ত্রিক-যানের সঙ্গে সহাবস্থান করে আছে উটের গাড়ি। কয়েক-খানি উটের দোতলা গাড়ি যাত্রী বোঝাই হয়ে যেতেও দেখলাম, আবার ফিরতেও দেখলাম। কোনও ব্যস্ততা নেই। ধীরে সুস্থে বেশ তালে তালে পা ফেলে চলেছে উট ঐ বিশাল গাড়ি টেনে টেনে। মথুরায় দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থানে নূতন সুরম্য মন্দির। ৮ই ভাদ্র ২০১৫ বদী-সম্বৎ অর্থাৎ ৬ বৎসর আগে এই মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন স্বধর্মনিষ্ঠ পরম ভাগবত শ্রীহনুমান প্রসাদ পোদ্দার মহাশয়। এ বৎসর ২০২১ বদী-সম্বৎ-এর ভাদ্রপদ ৮ তারিখে (ইংরাজী ৩০শে আগস্ট ১৯৬৪ সাল) শুভ জন্মাষ্টমীর দিন আমাদের ঐ পুণ্যস্থান দর্শনের সৌভাগ্য হ'ল। তার ঠিক পাশেই বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত মসজিদ।

এইবার শেষ করি এই তীর্থযাত্রার বিবরণী। আগ্রার তাজমহল বা দিল্লীর লালকেল্লা, কুতবমিনার প্রভৃতির উল্লেখ ও বর্ণনা করলাম না এই তীর্থযাত্রার কাহিনীতে। ফিরে এলাম মেদিনীপুরে। মনে হতে লাগলো—কোথায় গিয়েছিলাম! আবার কোথায় ফিরে এলাম! পার্বত্য পথের অবর্ণনীয় দুর্গমতা লঙ্ঘন করে কার বা কিসের আকর্ষণে কী পাবার আশায় গিয়েছিলাম? কী পেলাম? কী দেখে এলাম? কিছুই বলবো না, বলার বস্তুও তা নয়। দেবতা তো মানুষেরই সৃষ্টি, মানুষের পরিকল্পনা। কিন্তু সেই মানুষের সৃষ্ট দেবতা কী এক অদৃশ্য ঐশী শক্তি সঞ্চারিত করেন মানুষের মনে। সেই শক্তির বলে মানুষ হয় সর্বজয়ী; মানুষের হয় অপ্রতিরোধ্য গতি। মানুষের কষ্ট-সহিষ্ণুতা, শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য পরীক্ষিত হয় তীর্থযাত্রায়। কে করে সেই পরীক্ষা? করে মানুষ নিজেই নিজের পরীক্ষা। করে স্বেচ্ছায়। আমার এই চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি বৎসরের জীবন-যাত্রায় ব্যর্থতার বেদনা অনুভব করতে হয়েছে অনেক। আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারিনি। দুর্গম তীর্থযাত্রার শক্তিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরে আনন্দিত হলাম।

শ্রীশ্রীকেদারনাথ তীর্থযাত্রা

যাত্রাকাল : মে, ১৯৬৩

সহযাত্রীবৃন্দ

যখন ছাত্র ছিলাম তখন থেকেই দেশ ভ্রমণের নেশা। প্রতি ছুটিতে বেরিয়ে পড়তাম। ঘুরেছি নদী-মাতৃক পূর্ব-বাংলায়; ঘুরেছি উড়িষ্যায়; ছোট-নাগপুরের ছোট ছোট পাহাড়ে ও বনেজঙ্গলে। তারপর কর্মজীবনেও সে অভ্যাস বজায় ছিল। পূজার ছুটিতে এবং 'বড়দিনে'র ছুটিতে বৎসরে দুবার বেরিয়ে ভারতের প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য অঞ্চল দেখার সুযোগ হয়েছে। গিয়েছি দক্ষিণে মাদ্রাজ, শ্রীরঙ্গম, পণ্ডিচেরী, তিরুপতি, সেতুবন্ধ, রামেশ্বর, ধনুস্কোডি, মাদুরা, কন্যাকুমারিকা; পশ্চিমে বোম্বাই, আমেদাবাদ, সোমনাথ, দ্বারকা; উত্তরে দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, হরিদ্বার। পুরী বারাণসী তো ঘরের কাছে, বহু-বহুবার গিয়েছি। কখনও পুরনো হয়নি।

কিন্তু ঠিক তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত কর্মজীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, ছুটি নয় এমন সময়ে, একমাস কাল বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারবো তা ভাবতে পারিনি। তাছাড়া কেদার-বদরীর পথের দুর্গমতা সুবিদিত। আগেকার দিনের বর্ণিত ভয়াবহ দুর্গমতা আর না থাকলেও সুগম বা সহজ-সাধ্য পথ নয়। সেই পথে হিমালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থদর্শনে যাওয়া ভগ্ন-স্বাস্থ্য, দুর্বল-হৃদয় আমার পক্ষে একেবারে অভাবনীয় ছিল। এবার তা সম্ভব হ'ল কেবলমাত্র গুরুকৃপায়, আর 'কুণ্ডু স্পেশালে'র কর্তৃপক্ষের সাদর আহ্বানে ও সযত্ন সহায়তায়। ম্যানেজার, তিনজন পাচক, চারজন পরিচারক আমাদের দলে গিয়েছিল। একজন ডাক্তারও সঙ্গে যাবার কথা। ব্যবস্থা খুবই ভাল। হাঁটা-পথে যাত্রীদের নিজ নিজ যানবাহন ও মাল-বহনকারী কুলীর ব্যয় পৃথকভাবে বহন করতে হয়। যাঁর যা প্রয়োজন, ডাণ্ডী কাণ্ডী বা ঘোড়া ভাড়া করতে হয়। যাঁরা সে পথটুকু পদব্রজে যান তাঁদের আর বাড়তি খরচ হয় না। হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন সহধর্মিণী অমলা দেবী ও কন্যা অঞ্জলি। আমরা স্থান পেলাম ১৯৬৩ সালের ৫ই মে তারিখের 'স্পেশালে'। এ একখানি ট্যুরিস্ট-কোচ। জুড়ে দেওয়া হয়েছে সাপ্তাহিক হাওড়া-দেরাদুন জনতা এক্সপ্রেসে। ট্যুরিস্ট কোচের মাঝখানে রন্ধনশালা; দুই পাশে ট্রেনের গা ঘেঁষে লম্বা বেঞ্চ আর মধ্যস্থলে এঁরা যতগুলি সম্ভব আলগা বেঞ্চ দিয়ে যাত্রীদের শয়ন-উপযোগী স্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথমটা কিন্তু গোলমাল

ও বিশৃঙ্খলা হ'ল। ট্রেন ছাড়তেও বেশ খানিক দেরি হয়ে গেল।

পরদিন ৬ই মে দুই ঘণ্টা দেরিতে ট্রেন এসে দাঁড়ালো গয়াধামে। আমাদের গাড়ি কেটে রেখে যথাসময়ে ট্রেন চলে গেল তার গন্তব্যপথে। ভ্রমণসূচী অনুযায়ী এমনি করে যাবার পথে একদিন করে গয়া, কাশী ও লক্ষ্ণৌ-এ আমাদের গাড়ি কেটে রাখার কথা। ভালই। গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্ম অক্ষয় বট, অন্তঃসলিলা ফল্গু নদী, কাশীধামে বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা দর্শন, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি বহুবার হলেও ভালই লাগলো।

৯ই মে বিষ্যুৎবার রাত্রি সাড়ে নটায় আমরা হরিদ্বারে এসে পেঁছিলাম। হরিদ্বারেও বহুবার এসেছি; তবু বড় মনোরম স্থান, বড় তৃপ্তিদায়ক এই সুরম্য স্থানের প্রভাব। শিবালিক পর্বতমালায় বেষ্টিত এই স্থান। ধূর্জটির জটাপাশ-মুক্ত সুরধুনী পতিত-পাবনী গঙ্গা পর্বতের পাদদেশ দিয়ে তীব্রবেগে ছুটে চলেছে। এদিকে মনসা পাহাড়, অপরদিকে নীলধারা ছাড়িয়ে চণ্ডী পাহাড়। হরের চরণ-চিহ্ন-সমন্বিত পবিত্র ব্রহ্মকুণ্ড। কতবার হরিদ্বারে এসেছি, থেকেছি। কিন্তু এর শান্তিময় প্রভাবের অনিবার্য আকর্ষণ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় না।

১০ই মে হরিদ্বারে থেকে, ১১ই মে শনিবার সকালে আমরা ঋষিকেশ স্টেশনে পেঁছিলাম। ট্রেন যাত্রার এইখানে বিরতি। ট্যুরিস্ট কোচ একটা সাইডিং-এ কেটে রাখা হ'ল—'কুণ্ডু স্পেশালে'র এক কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে। যাত্রীদের অ-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও চামড়ার জুতা প্রভৃতি ঐ গাড়িতে থাকলো। রবার-সোল ক্যাম্বিসের জুতা ও সুচালো লোহা-সংযুক্ত বাঁশের লাঠি আমাদের সহায় হ'ল এখান থেকে। রেন-কোট ও ছাতা তো আছেই; সঙ্গে থাকা চাই-ই। এই-দলে মেয়ে-পুরুষ নিয়ে মোট চল্লিশ জন যাত্রী ছিলেন।

সহ-যাত্রীদের কথা কিছু বলতে হবে। মানুষই যে সব চেয়ে বড় এবং সব কিছুর উপরে। মানুষ না থাকলে, মানুষ না দেখলে তীর্থই বা কী আর ভগবানই বা কোথায়? তাঁরও স্থান তো মানুষেরই অন্তরে। আমাদের দলে চল্লিশ জন যাত্রীর মধ্যে বিধবা ছিলেন দশ-বারো জন। তাঁদের অনেকের সঙ্গে কোনও পুরুষ আত্মীয় ছিল না। সধবা মহিলাও দুজন ছিলেন যাঁদের সঙ্গে পুরুষ আত্মীয় কেউ ছিল না। একজন বোলপুরের প্রখ্যাত কংগ্রেস কর্মী শ্রীঅমর সরকারের সহধর্মিণী শ্রীমতী রাণী সরকার। অপর জন কলকাতার সোনার গৌরাঙ্গ টেম্পল্ রোডের শ্রীমতী বীণাপাণি দাঁ। দুজনেই মধ্যবয়সী। বিধবাদের মধ্যে ঐ রকম বয়সের নিঃসঙ্গ একজন ছিলেন, তাঁর নাম শ্রীমতী উষা দিনী

দাসী। ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা। এঁদের সকলেরই সৎ-সাহস প্রশংসনীয়।

পুরুষের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বিহার বা উত্তরপ্রদেশের, যাচ্ছিলেন স-স্ত্রীক। একজন ছিলেন দক্ষিণ ভারতীয়, নাম শ্রী আয়ার। কোন এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বুঝি ম্যানেজার ছিলেন; অবসর গ্রহণের পরেও দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত হুকুম করার অভ্যাস তাঁর যায়নি। সব সময়ে সকলের সঙ্গে হুকুমের স্বরে কথা বলেছেন তিনি। তা দরকার থাক্ বা না থাক্। 'এখানে দড়ি খাটিয়ো না,' 'ওখানে কাপড় টাঙ্গিয়ো না' এরকম হুকুমের তো কথাই নেই। কুণ্ড স্পেশালের বেচারী কর্মচারীদের উপর তাঁর হুকুম ও তম্বির অন্ত ছিল না। কথায় কথায় তাদের বলতেন 'স্টুপিড, রাসকেল।' এঁর নামকরণ হয়েছিল 'রুদ্রভৈরব'। অদ্ভুত উপায়ে ইনি কিন্তু কলকাতার বিপুলকায় জুয়েলার মশাই-এর পরিবারভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

জুয়েলার মহাশয়ের স্বাস্থ্য-সম্পন্ন বিপুল দেহ। বয়স সত্তর হলেও শারীরিক সামর্থ্য আছে প্রচুর। পাচক-পরিচারক মহলে তাঁর নাম রটে গিয়েছিল 'বিপুলবাবু' বলে। ভাগ্যবান পুরুষ। স্ত্রী, শ্যালিকা ও দুই কন্যাসহ চলেছেন তীর্থ-পর্যটনে। গৃহিণী ও গৃহিণীর ভগ্নী প্রত্যেকেই লক্ষ্মীমন্ত ঘরের স্বাভাবিক মেদ-বহুলতায় সমৃদ্ধ। জুয়েলার মশাই-এর তো কথাই নেই। এঁরা তিন জন হাঁটা-পথে তিনটি ডাণ্ডী ভাড়া করেছিলেন; ডাণ্ডীর স্বল্প পরিসর খোলে তাঁরা চেপেচুপে বসে ডাণ্ডী-বাহকদের দ্বারা বাহিত হয়েছেন। বাহকের সংখ্যা বেশী করার প্রস্তাবে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়েছিলেন। আমাদের ডাণ্ডীবাহকদের পথে চা খাওয়ার জন্য প্রতিদিন আড়াই টাকা তিন টাকা দিতাম, তাদের সুখ-দুঃখের কথা, পারিবারিক কথা শুনতাম বলে জুয়েলার মশাই চটে গিয়ে একদিন গম্ভীর স্বরে আমাকে উপদেশ দিতে এসেছিলেন—"এদের মাথা খাচ্ছেন আপনি, বড় আস্কারা দিচ্ছেন, চা খেতে টাকা দিচ্ছেন কেন?" হাসি পেয়েছিল তাঁর ভাব দেখে আর কথা শুনে। উপদেশ দিতে আসার কারণ শুনলাম; তাঁদের ডাণ্ডী-বাহকরা আমার নজির দেখিয়ে ওঁর কাছে চা খেতে পয়সা চেয়েছিল। আমি তাঁকে বলেছিলাম—এতদিকে এত খরচ হচ্ছে, আর যারা আমাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চলেছে, যাদের সাহায্য না পেলে আমার পক্ষে ঐ দুর্গম পার্বত্য পথে যাওয়াই সম্ভব ছিল না তাদের একটু চা খেতে দিলে কি অন্যায় হয়?

যাক, বিচিত্র মানুষের মন। উত্তুঙ্গ বিশাল উদার হিমালয়ে এসে ও খুঁটিনাটি হিসাবের সঙ্কীর্ণতা মনের গায়ে লেগে থাকে; মনকে সঙ্কুচিত করে দেয়।

কাঁচের ঘরে রাখা নিক্তি ধরে ওজন করার হাত সহসা কি বহুদিনের সঞ্চিত অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে ? নিন্দা করি না, তবে দেখেছি আত্ম-সচেতন জুয়েলার মশাই সর্বত্র সকল সময়ে দেহের ভারে ও মনের উত্তাপে সকলকে আপন মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করার প্রয়াসী ছিলেন। আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় ছিলেন অত্যধিক যত্নশীল। আয়ার মশাই কী আশ্চর্য উপায়ে এঁদের পরিবারভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। হাঁটাপথে অন্য সকলের কাছ থেকে পৃথক ঘরে জুয়েলার মশাই সপরিবারে থাকার ব্যবস্থা করতেন ; তার ভিতরে কিন্তু স্থান করে নিয়েছিলেন আয়ার মশাই। পথের আত্মীয়তা বুঝি এমনি করে গড়ে ওঠে। নিঃসম্পর্কিত পরও কত আপনার হয়। বাঙ্গালী-মাদ্রাজীর কোনও পার্থক্য থাকে না।

এমনি করে অপরিচয়ের বাধা লঙ্ঘন করে পরস্পর একান্ত আপন জন হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল আরও দুজনকে। নারী ও পুরুষ। নারী বিধবা, উষাঙ্গিনী দাসী, এঁর নাম আগেই করেছি। পুরুষ অবিবাহিত, নাম রামলাল দাস, বয়স সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ হতে পারে। তিনি তাঁর পরিচয় দিলেন 'প্রিন্স ভ্যাগাবণ্ড' বলে। তাঁর বাড়ি ছিল বিক্রমপুরে, এখন থাকেন কোন্ একটা 'কলোনী'তে। মা-ছেলে সম্পর্ক পাতিয়ে এঁরা পরস্পরের কী সাহায্য ও সাহচর্যই না করেছেন! হাঁটাপথে চটি ও ধর্মশালায় এঁরা দুজনে একই সঙ্গে থেকেছেন। একই শয্যায় বা পাশাপাশি শয্যায় শয়ন করেছেন, তা নাকি দৃষ্টিকটু বলে কেউ কেউ ম্যানেজার শ্রীমান বাদলচন্দ্রের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। ফেরার পথে শ্রীনগরে যে যাত্রীনিবাসে শেষ রাত্রি কাটাতে হয়েছিল, সেখানে শ্রীমতী উষাঙ্গিনীর শয্যার পাশে শয্যা বিছিয়েছিলেন সোনার গৌরাঙ্গ টেম্পল রোডের শ্রীমতী বীণাপাণি দাঁ। কিন্তু তাঁর পাতা বিছানা একটু সরিয়ে দিয়ে দুজনের মাঝখানে এসে শুয়ে পড়েন শ্রীরামলাল দাস শ্রীমতী বীণাপাণির আপত্তি অগ্রাহ্য করে। কি আর করবেন ? শ্রীমতী বীণাপাণি সেখান থেকে আপন শয্যা সরিয়ে নিয়ে আসেন, তবে অভিযোগ করেন ম্যানেজারের কাছে। বেচারী ম্যানেজার গিয়ে দেখে 'মা ও ছেলে' নির্বিকার ভাবে ইতিমধ্যে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। বলার কিছু নেই।

জুয়েলার মশাই, আয়ার মশাই ও এই 'মা-ছেলে' এঁরা ট্রেনে ট্যুরিস্ট কোচে আমাদের কামরায় ছিলেন না ; এঁরা ছিলেন রন্ধনশালার ও-পাশের

কামরায়। আমাদের কামরায় আমাদের সব চেয়ে কাছে ছিলেন এক প্রৌঢ় দম্পতি শ্রীগোকুল দে ও তাঁর সহধর্মিণী। দুজনেরই শান্ত স্বভাব, স্নিগ্ধ আচরণ। গোকুলবাবুর বয়স ৬৮ বছর বললেন। কিন্তু বেশ বলিষ্ঠ গঠন। গোকুলবাবুর স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল ট্রেনের বেঞ্চে এবং তাঁর স্ত্রীর স্থান হয়েছিল তাঁর পাশে পাতা বেঞ্চে। কিন্তু হাওড়া স্টেশনে জনৈক অফিসার সহযাত্রী, ডাক্তার পরিচয়ে কিছু বেশী সুবিধা পাবার উদ্দেশ্যে গোকুলবাবুর নাম লেখা কাগজ ছিঁড়ে দিয়ে সাদা কাগজে নিজের নাম লিখে গোকুলবাবুর জন্য নির্ধারিত স্থানে এঁটে দেন ও দখল করেন। ঐ বেঞ্চ নিয়ে ফিরবার সময় এক অতি কদর্য লজ্জাজনক ঘটনা ঘটেছিল। সে কথা পরে বলবো। পাতা বেঞ্চের অপরিসর স্থানে গোকুলবাবু ও তাঁর স্ত্রীর স্বচ্ছন্দ শয়নের স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিল না। গোকুলবাবু নির্বিকারচিত্তে কয়েক রাত বসেই কাটিয়ে দিলেন। গুন গুন করে গান করতেন। গলায় তুলসী কাঠের মালা। বেশ প্রসন্নভাব।

তাঁদের পরে একটা ট্রেনের বেঞ্চে স্থান করে নিয়েছিলেন শ্রীমতী রাণী সরকার। তিনি সম্ভ্রম ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতেন। সঙ্গে থাকা 'বিবেকানন্দের জীবনী' মাঝে মাঝে পড়তেন, কথা কম বলতেন, সকালে শয্যাত্যাগ করতেন অনেক দেরিতে। ঐ ধরনের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখছিলেন কলকাতার অফিসার বাবুটি, যিনি গোকুলবাবুর জন্য নির্দিষ্ট বেঞ্চ দখল করে নিয়েছিলেন। তিনি যতদূর সম্ভব অফিসারসুলভ গাম্ভীর্য বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকতেন। লোককে হুকুম করতে ও অহেতুক পরনিন্দায় বেশ উৎসাহশীল। তা ছাড়া তিনি নাকি চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। কুণ্ডু স্পেশালের লোকেরা তাঁকে ডাক্তারবাবু বলে সম্বোধন করতো। আমরাও ডাক্তারবাবু বা অফিসার-বাবু বলে তাঁর উল্লেখ করবো। একখানি বড় খাতায় অনেকক্ষণ ধরে কি সব লিপিবদ্ধ করতেন।

তাঁর ঠিক পাশেই ছিলেন এক ধনী অ-বাঙ্গালী ব্যবসায়ী, তাঁর নাম দেওয়া যাক শিউরতন। ভক্ত লোক। গলায় তুলসী কাঠের মালা; মাঝামাঝি বয়স। চলেছেন ধর্ম-আচরণে স-স্ত্রীক। তাঁর ভক্ত অনুরাগী বহু লোক এসেছিল হাওড়া স্টেশনে তাঁদের বিদায় দিতে। সুগন্ধি পুষ্পমাল্য এনেছিলেন তাঁরা এঁদের সম্বর্ধনা জানাতে। সঙ্গে দুজন 'মুনিম' চলেছে। একজন 'হিন্দুস্থানী' অপরজন বঙ্গভাষী, নাম কালীকেষ্ট দাস। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ;

নামের সার্থকতা পুরোপুরি। ক্ষীণদেহ, কিঞ্চিৎ খঞ্জ। শরীরের অস্থি-সন্নিবেশ গোপন করবার মত মাংস বা মেদ কোথাও তিনি সঞ্চিত হতে দেননি। কেবলমাত্র চর্ম-আচ্ছাদিত। এঁকে দেখলে 'পরশুরাম' রচিত গল্পে "কারিয়া পিরেত বা" মনে পড়ে যায়। শিউরতনবাবুর ভার্যা পদমর্যাদায় অত্যধিক সচেতন। ধনী গৃহিণীর পরিচয় স্বরূপ প্রচুর অলঙ্কার-ভার তিনি সানন্দে আপন ক্ষীণ অঙ্গে বহন করছিলেন, মূল্যবান রঙীন বসন পরিধান করে-ছিলেন; রঙীন রেশমী ছাতা তাঁর রক্তহীন ফ্যাকাশে হাতের শোভাবর্ধন করতো। সর্বপ্রকার আধুনিক প্রসাধন-সামগ্রী তাঁর সঙ্গে চলেছিল। শিউরতনজী প্রাতঃস্নান করে বসতেন স্তব পাঠ করতে, মালা জপ করতে; তাঁর পাশেই তাঁর গৃহিণী বসতেন আয়না সামনে রেখে কেশবিন্যাসে, অবাধ্য সাদা চুলগুলিকে কৃষ্ণবর্ণে বর্ণান্তরিত করতে, লিপস্টিক, স্নো, রুজ প্রভৃতির যথাস্থানে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করতে। শিউরতনজীর সহগামী হিন্দুস্থানী দীর্ঘাকৃতি ভক্ত ব্যক্তি। তবে তিনি যখন অপ্রশস্ত ছোট গামছা কোমরে জড়িয়ে শৌচাগারে যেতেন ট্রেনের কামরায়, বড়ই দৃষ্টিকটু লাগতো। তবে ঐ প্রকার দৃষ্টিকটুতা সৃষ্টিতে তাঁকে হারিয়েছিলেন চৈতন সেন লেনের শ্রীমত্যা পূর্ণময়ী দাসী।

পূর্ণময়ী বয়স্থা বিধবা, বিশাল পরিধিসম্পন্না। তিনিও অবলীলাক্রমে ছোট্ট একটু গামছায় তাঁর মেদবহুল দেহের মধ্যভাগ কোনও রকমে অর্ধ-আবৃত করার প্রয়াস প্রদর্শন করে ট্রেনের শৌচাগারে যাতায়াত করতেন, এমন কি তদবস্থায় স্টেশন প্লাটফর্মে নেমে গিয়ে হাতে মাটি করতেন, প্রকাশ্য কলে স্নান করতেন, স্নানের ঘর একাধিক আমাদের কামরায় থাকা সত্ত্বেও। তিনিও বৈষ্ণব। মালা জপ করতেন প্রায় সর্বক্ষণ। থলির ভিতর হাতও ঘুরছে আর প্রকাশ্যে মুখও চলছে। অপরের দোষ-ত্রুটি ধরা, মুহুর্মুহু সকলকে সতর্ক করা, তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কে কি করছে তা লক্ষ্য করা, কিছুই তিনি বাদ দিতেন না ঐ মালাজপের মধ্যে। বড়ই বিশ্রী লাগতো দেখে যে শুচিতার যূপকাষ্ঠে তিনি শালীনতা-বোধকে নির্মমভাবে বলি দিতেন। ইনি বহুতীর্থ একাকী পর্যটন করেছেন শুনলাম কুণ্ডু স্পেশালের সহায়তায়। এঁকে সকলে মাসী বলতো। মাসীই বটে। প্রবোধ সান্ন্যাল মহাশয়ের 'মহাপ্রস্থানের পথে'র কাহিনীতে এই রকম এক মাসীর বর্ণনা আছে। অপরের সকল কাজে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, নিজের সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন। মুখের ভাব ও ভাষার সুর পরিবর্তনে এঁর দেখেছি বিস্ময়জনক দক্ষতা। শিউরতনজী ও তাঁর ভার্যা এঁর ঠিক পাশেই পরিপর

দুখানি পাতা বেঞ্চে থাকতেন ট্রেনে। ইনি তাঁদের বলতে শুরু করলেন—'আহা যেন সাক্ষাৎ শিব-দুর্গা'। পরে প্রত্যাবর্তনের পথে দুর্গা সহসা যখন দুর্গতিহারিণী না হয়ে দুর্গতিদায়িনী রণ-রঙ্গিণী মূর্তিতে প্রকটিত হয়েছিলেন তখন এঁর দ্রুত পরিবর্তনশীল শ্লেষসূচক মুখভঙ্গী অন্যের উপভোগ্য হয়েছিল।

এতক্ষণ উল্লেখযোগ্য সহযাত্রীদের কথা কিছু বললাম। এইবার পথে নেমে পথের কথা বলি। ঋষিকেশ থেকে লোহা-বাঁধানো সমান্তরাল রেলপথ ছেড়ে পিচঢালা পথে 'বাস' যাত্রা আরম্ভ হবে। ১১ই মে শনিবার সমস্ত দিনরাত্রি আমাদের থাকতে হ'ল ঋষিকেশ স্টেশনে বিশ্রাম-রত ট্যুরিস্ট কোচে। এখানে আমাদের যাত্রীদলে নূতন তিনজন এসে সংযুক্ত হলেন। তিনজনই বৈষ্ণবী; চুঁচুড়া ষণ্ডেশ্বরতলা থেকে আসছেন। পরবর্তী ট্রেনে এসে এইখান থেকে 'কুণ্ডু স্পেশালে'র তত্ত্বাবধানে তাঁরা আত্মসমর্পণ করলেন। এঁদের একজন খুবই দীর্ঘাকৃতি, আয়ত-নয়ন, কুঞ্চিত কেশদাম, কথাবার্তায় খুবই সপ্রতিভ। না পুরুষ না মেয়ে ভাবের। এঁর নামকরণ হয়েছিল অর্ধনারীশ্বর। এঁকে প্রায় সকলেই এড়িয়ে চলতে সচেষ্ট দেখেছিলাম। কিন্তু তাঁরা পরিত্রাণ পাননি। এঁর দাপট সকলকেই ভাগ করে সইতে হয়েছিল।

॥ পর্বতারোহণ—বাস্‌এ ॥

১২ই মে রবিবার সকাল ছটায় ঋষিকেশ স্টেশন থেকে দুখানি সংরক্ষিত মোটর-বাসে জিনিসপত্রসহ আমরা উঠে বসলাম। যাত্রা হল শুরু। এদিককার সব 'বাস্' দেখলাম "গাড়োয়াল মোটরওনার্স ইউনিয়নের" অন্তর্ভুক্ত। আমরা এখন যাব রুদ্রপ্রয়াগ; ঋষিকেশ থেকে ৮৮ মাইল দূরে। মন্দাকিনী ও অলকানন্দার মিলন-স্থল। সেখান থেকে মন্দাকিনীর তীর ধরে পার্বত্যপথে যেতে হবে কেদারনাথে; আর অলকানন্দার তীর ধরে বদ্রীনাথে। কেদারের পথে 'মোটর-বাস্' যায় 'কুণ্ড' চটি বা 'কাকরাগার্ড' পর্যন্ত ২১ মাইল। সেখান থেকে হাঁটাপথে আরও ২৭ মাইল গেলে শ্রীশ্রীকেদারনাথধাম। 'মোটর বাসে' যেতে হলে ফিরে আসতে হয় শ্রীশ্রীকেদারনাথ দর্শনের পর আবার রুদ্র-প্রয়াগে; এবং সেখান থেকে অলকানন্দার তীরে তীরে যেতে হবে 'মোটর বাসে' যোশীমঠ পর্যন্ত। ৬৮ মাইল পথ। তারপর হাঁটাপথে ১৯ মাইল

গেলে শ্রীশ্রীবদ্রীবিশালের মন্দির। যাঁরা বরাবর পায়ে হেঁটে যান তাঁদের জন্য কেদার দর্শনের পর অন্য পথ আছে বদরীনাথে যাওয়ার।

এখন আমাদের 'মোটর বাস্' দুখানি ঋষিকেশ ছাড়িয়ে লছমনঝুলা ডান পাশে ছেড়ে দিয়ে আঁকা-বাঁকা পার্বত্যপথে সন্তর্পণে চললো এগিয়ে। একটু গিয়েই একস্থানে দেখা গেল সারি সারি বহু 'বাস্' ও 'ট্রাক' দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করতে হ'ল, উপর থেকে সব গাড়ি নেমে না আসা পর্যন্ত। একমুখী পথ। প্রহরারত পুলিস সেখানে নিয়ন্ত্রণের জন্য দণ্ডায়মান। হাতে 'হুইসিল'।

৪৪ মাইল পথ অতিক্রম করে বেলা সাড়ে এগারোটায় এসে পৌছলাম দেব-প্রয়াগে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম, চিত্ত-মুগ্ধকর। সমুদ্র-তট থেকে মাত্র ১,৫৫০ ফিট উঁচুতে অবস্থিত। নীলাভ স্বচ্ছ-সলিলা অলকানন্দার সহিত এখানে মিলিত হয়েছে কলুষনাশিনী ভাগীরথীর আবর্তময়ী পঙ্কিল ধারা। সম্মিলিত হয়ে হয়েছে গঙ্গা নামে অভিহিত। তটিনী-তট-বর্তী অগণিত গৃহরাজি এইস্থানকে এক জনবহুল নগরের রূপ দিয়েছে। রঘুনাথ রামচন্দ্র নাকি রাবণবধরূপ ব্রহ্মহত্যার পাপ-স্খালনের জন্য এইস্থানে তপস্যা করেছিলেন। সেই স্মরণীয় ঘটনার স্মারক স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি সম্বলিত এক বৃহৎ মন্দির এখানে আছে। কেদার-বদরীর পাণ্ডাগণ এই দেবপ্রয়াগে বাস করেন।

এখানে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে হ'ল, নিম্নগামী গাড়িগুলির আগমন-প্রতীক্ষায়। কুণ্ডু স্পেশালের লোকেরা মোটর বাসের ভিতরেই যাত্রীদের হাতে দিলেন মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য কাগজের প্যাকেটে করে লুচি, তরকারী ও মিষ্টান্ন। আমরা কিন্তু নিচে নেমে একটা জলের কলে মাথা ধুয়ে নিলাম এবং কাছেই পাহাড়ের গায়ে আবিষ্কার করলাম 'অন্নপূর্ণা হোটেল', সেখানে বেশ সুস্বাদু মোটা লাল রং-এর চালের ভাত, ডাল, আলুর তরকারী এক এক প্লেট মাত্র পঞ্চাশ পয়সার বিনিময়ে খেয়ে নিলাম। ভালই লাগলো খেতে।

বারোটার পর দেব-প্রয়াগ ছেড়ে একটার সময়ে আমাদের 'বাস্' এলো কীর্তি-নগরে। দোকান বাজার নিয়ে বেশ ছোটখাটো একটি শহর। সমুদ্রতট ১,৮০০ ফিট উঁচুতে। বেলা দেড়টায় এলাম শ্রীনগরে। আগে এখানে ছিল গাড়োয়াল রাজ্যের রাজধানী। সুন্দর বড় শহর। সবই আছে এখানে। দেবপ্রয়াগ থেকে ১৯ মাইল দূর। সত্যযুগে নাকি রাজা সত্যসন্ধ নদীগর্ভে শ্রীযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে পূজা করতেন। তার আর অস্তিত্ব নেই। কলিযুগে আদি

শঙ্করাচার্য শ্রীযন্ত্রের আকারে এই নগর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে এই নগরের নিম্নে প্রবাহিতা বিরেহী-গঙ্গার জলপ্লাবনে ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়েছিল এই নগর; রক্ষা পেয়েছিল একমাত্র কমলেশ্বর মহাদেবের মন্দির। সে মন্দির এখনও বিদ্যমান। আরও কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির আছে। বাবা কালি-কমলিওয়ালার বিরাট ধর্মশালা আছে; তার উপর ১৯৬১ সালে এক প্রশস্ত ইষ্টক নির্মিত যাত্রী-ভবন নির্মিত হয়েছে। তার ব্যবস্থা আরাম-দায়ক। মধ্যস্থলে বিশাল 'হল ঘর'; তার ভিতরে চার-পাঁচশ লোক শয্যা বিছিয়ে শুয়ে থাকতে পারে। দুপাশে ছোট ছোট কামরা আছে, যেখানে পঞ্চাশ পয়সা ভাড়ায় ছোট ছোট তক্তাপোশ অনেকগুলি আছে। এই যাত্রীভবনে বদ্রীনাথ থেকে ফেরার পথে একরাত্রি এবং পথে কাটাবার সেই শেষ রাত্রি, আমাদের থাকতে হয়েছিল। শ্রীমতী উষাঙ্গিনী ও শ্রীমান রামলালের বিরুদ্ধে শ্রীমতী বীণাপাণির অভিযোগের কারণ ঘটেছিল এইখানেই। যাক্ সে কথা।

মনে পড়ে সেই ফেরার পথে এই যাত্রীভবনে সকলের সঙ্গ ত্যাগ করে পূর্ববর্ণিত বিপুলবাবু জুয়েলার পাশের ছোট ও অন্ধকার ঘরে স-আয়ার সপরিবারে তক্তাপোশ ভাড়া নিয়ে রাত কাটিয়েছিলেন এবং রাত্রি ৩টেয় শয্যাত্যাগ করে সংরক্ষিত 'বাসে' সামনের সীটে গিয়ে বসে ছিলেন। মনে পড়ে বাসুদেব গণেশ নামে এক ভদ্রলোক কেদার-বদরী ও গঙ্গোত্রী তীর্থ দর্শন করে সপরিবারে এসে ঐ যাত্রীভবনের বারান্দায় ভিজে মাটির উপর পরম আনন্দে নিশ্চিন্ত মনে শয্যা বিছিয়ে শুয়েছিলেন। তীর্থ দর্শনের প্রশান্তি তাঁর মনকে অন্তর্মুখী করতে পেরেছিল, বাহিরের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। এসব ফিরবার পথের কাহিনী। এখন আমরা কেদার-যাত্রার পথে।

বেশ কিছু সময় শ্রীনগরে মধ্যাহ্ন কালের রৌদ্র তাপ সহ্য করে থাকতে হ'ল আমাদের। 'বাস্' চালকদের স্নানাহার বিশ্রাম চাই তো। তারা তো তীর্থ-যাত্রী নয়। তাদের দৈনন্দিন কাজ ঐ পথে যাওয়া আসা। সমুদ্রতট থেকে মাত্র ১,৭০৬ ফিট উঁচু এই স্থান। বেশ গরম বোধ হতে লাগলো। বিকেল তিনটেয় 'বাস্' আবার চলতে শুরু করলো। সন্ধ্যার পূর্বে ছটায় এসে পৌছে ছিল রুদ্রপ্রয়াগে। সমুদ্রতট থেকে মাত্র ২,০০০ ফিট উঁচুতে। শ্রীনগর থেকে মাত্র ১৮ মাইল পথ। কিন্তু সময় লাগলো প্রায় তিন ঘণ্টা। পথে দুই জায়গায় অনেকক্ষণ করে দাঁড়িয়ে ছিল। 'বাস্' থেকে আমরা নামলাম প্রশস্ত স্থানে বাজারের ভিতরে। অলকানন্দার তীরে। এপারে ঘর বাড়ি দোকান-

পশার বাজার, অপর পারে রুদ্রপ্রয়াগ টানেল, রুদ্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির, ধর্মশালা প্রভৃতি।

আমরা 'বাস্' থেকে নেমে কিছুটা ঢালু পথে এলাম এক লৌহ-সেতুর মুখে। তার উপর দিয়ে সন্তর্পণে এপারে এসে অনেকটা চড়াই ভেঙে উঠে রুদ্রপ্রয়াগ টানেলের ঠিক সামনেই পেলাম আমাদের জন্য নির্দিষ্ট বাবা কালি-কমলি-ওয়ালার দ্বিতল চটি। মাটির বাড়ি। মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি উঠেছে, দুপাশে লম্বা ঘর ও বারান্দা। জানালা-দরজা নেই। মাটির মেঝেয় যে যার বিছানা বিছিয়ে শয়ন করে এখানে। নীচে হয় রান্না। লোকও থাকে। ম্যানেজার বাদলচন্দ্র 'বাস্' থেকে জিনিসপত্র সব কুলী দিয়ে নামিয়ে এই চটিতে এনে পৌঁছে দিলেন।

যাত্রীর ভিড় এখানে লেগেই আছে। দুটি প্রধান তীর্থযাত্রার পথের সংযোগস্থল। অন্ধকার ঘরের ভিতর প্রথম প্রবেশ করে সেদিন সন্ধ্যায় খুবই অস্বস্তি বোধ হয়েছিল। কেদার বদরীর পথে যত জায়গায় নামতে ও থাকতে হয়েছে আমাদের, কোথাও এর চেয়ে অপরিচ্ছন্ন অসুবিধাজনক ও পীড়াদায়ক স্থান আর দেখিনি। তীর্থযাত্রীর মন ঠিক প্রস্তুত কিনা, নির্লিপ্ততা এসেছে কিনা তার অন্তরে, তা যাচাই করে দেখার জন্য একটু কড়া হাতের ধাক্কা দিয়ে এইখানে বুঝি পরীক্ষা করেন ভগবান। তাই ঠিক। কলকাতার যে অফিসার ভদ্রলোক হাওড়া স্টেশনে গাড়িতে উঠেই নিজের সুবিধার জন্য অপরের নাম লেখা ধারের বেঞ্চ দখল করে বসেছিলেন, এবং সর্বত্র নিজের সুখ-সুবিধা ও পদ মর্যাদার উপযুক্ত সম্মান খুঁজে এসেছিলেন, তিনি এই রুদ্রপ্রয়াগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না।, এসেই সন্ধ্যার পর বললেন, খুব অসুস্থ বোধ করছেন, খোঁজ করলেন বরফ পাওয়া যায় কিনা। সরকারী চাকুরির সঙ্গে নিজে ডাক্তারীও করেন। বাইরে থেকে তাঁর স্বাস্থ্যের কোনও ব্যতিক্রম দেখা গেল না। মনে হ'ল বোধ হয় মানসিক অস্বস্তিজনিত ব্যাধি বা বাধা। হয়ত কলকাতার আরামে অভ্যস্ত দেহ পথক্লেশ সহ্য করতে অপারগ হয়েছিল। পরদিন মধ্যাহ্নে স্নানাহার করে তিনি ফিরে গেলেন ঋষিকেশে, সেখান থেকে ট্রেনে প্রত্যাবর্তন করবেন কলকাতায়। এঁর জন্য মনে দুঃখ হ'ল। তীর্থের পথে আরামের আশা করা চলে না। ছিদ্রান্বেষী মন আপন মালিন্যে সামনের পথ দেখতে পায় না; তাকে ফিরে যেতে হয়।

রুদ্রপ্রয়াগ উল্লেখযোগ্য পার্বত্য শহর। এর প্রাকৃতিক শোভাও অবর্ণনীয়।

শ্রীশ্রীকেদারনাথ যাত্রাপথের সিংহদ্বার এই রুদ্রপ্রয়াগের টানেল। সেখান থেকে মন্দাকিনীর ধারে ধারে এঁকে বেঁকে সঙ্কীর্ণ পার্বত্য পথ এগিয়ে গিয়েছে কোথাও চড়াই কোথাও উৎরাই অতিক্রম করে। উভয় পার্শ্বে গভীর অরণ্য। কয়েক বৎসর আগে বিখ্যাত পাশ্চাত্য শিকারী জিম্ করবেট রুদ্রপ্রয়াগের জঙ্গলে এক চিতাবাঘ শিকার করেছিলেন। অলকানন্দার তীরে একস্থানে তার স্মারক চিত্র প্রদর্শিত আছে। পর্বতগাত্রে কিছু উর্ধ্বে রুদ্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির। যাত্রীভবন প্রভৃতি আছে। সব পাকাঘর। জলের কল আছে পাশেই। সুন্দর ব্যবস্থা। অর্থের বিনিময়ে সেই সব ঘরে অবস্থানের অনুমতি পাওয়া যায় মন্দির কমিটির কাছ থেকে। কলকাতার জুয়েলার মশাই যাবার সময় ও ফিরবার সময় ঐখানে ঘর ভাড়া নিয়ে স-পরিবার ও স-আয়ার ছিলেন। ওঁরা কোথাও সকলের সঙ্গে একত্রে থাকতে রাজী ছিলেন না। সর্বত্র স্বাতন্ত্র্য ও দূরত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন।

রুদ্রেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের নিচে রাস্তা থেকে প্রায় একশত ধাপ সিঁড়ি নেমে গিয়েছে অলকানন্দা-মন্দাকিনীর সঙ্গমে। সেখানকার দৃশ্য বিস্ময়কর। কী প্রচণ্ড জল-কল্লোল। কী সুতীব্র গতিবেগ! অগণিত বিশালকায় প্রস্তর-খণ্ডের বাধা উল্লঙ্ঘন করে আছড়ে পড়ছে দুদিক থেকে দুই স্রোতস্বতী। তীরে সঙ্গমের কাছে এক মাতাজী প্রতিষ্ঠিত 'চামুণ্ডা' দেবীর মন্দির আছে। পোস্টাফিস, লাইব্রেরীও আছে দেখা গেল।

সন্ধ্যা কেটে গেল এইসব দেখে বেড়িয়ে। রাত্রে কিন্তু আমার উপর দিয়েও বেশ একটু পরীক্ষা হয়ে গেল। হঠাৎ অসহ্য কানের যন্ত্রণা শুরু হ'ল। ঘুম তো অসম্ভব। বালিশে মাথা রাখতে পারা যায় না, এত যন্ত্রণা। সমস্ত রাত কেটে গেল যন্ত্রণায়। সঙ্গে থাকা সিদ্ধ মলম গরম করে বার দুয়েক কানের ভিতর দিল কন্যা অঞ্জলি। তুলো দিয়ে কান বন্ধ করাও হ'ল। একটু জ্বরভাবও বোধ হ'ল। কিন্তু মন স্থির ছিল। কলকাতার অফিসারবাবু আমাকেও তাঁর সঙ্গে ফিরে যেতে উপদেশ দিয়েছিলেন। আমার সহধর্মিণীকে বলেছিলেন ঐ অবস্থায় আমাকে ঐ দুর্গম পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই দুঃসাহসিক কার্য; ফিরে যাওয়াই কর্তব্য। সহধর্মিণী সঙ্গে থাকা গুরুদেবের ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন, ইনিই নিয়ে যাচ্ছেন যা করবার ইনিই করবেন। গুরুদেব দণ্ডীস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী। গঙ্গোত্রী নিবাসী সন্ন্যাসী। দোলপূর্ণিমায় জন্ম, বৈশাখী পূর্ণিমায় স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ। সুতরাং গুরুকৃপা ভরসা করে

যেতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে।

এ পথেরও একটা দুর্নিবার আকর্ষণ আছে। পথ যত দুঃসাধ্য ও দুর্গম তত বেশী যেন এর আকর্ষণ। এ পথে এলে আর ফেরা চলে না। তাই কানের যন্ত্রণায় অসুস্থ শরীর নিয়ে এগিয়েই গেলাম। ১৩ই মে সোমবার মধ্যাহ্নে আহারাদির পর দুখানি এপারের পৃথক সংরক্ষিত 'বাসে' মালপত্রসহ রুদ্রপ্রয়াগ টানেল থেকে ১-২০ মিনিটে কেদার অভিমুখে আমাদের যাত্রা আবার শুরু হ'ল। পার্বত্য পথে ঘুরে ঘুরে 'বাস্' চলেছে, কখনও উর্ধ্বমুখে, কখনও নিম্নমুখে। ডানদিকে উচ্চ পর্বতগাত্র; বামে বহু নিম্নে খরস্রোতা মন্দাকিনী যেন নানা সুরের ঝঙ্কার তুলে আমাদের এগিয়ে যেতে বলছে। কোনও কোনও স্থানে পথের অবস্থা খুবই বিপজ্জনক। আল্‌গা পাথরের স্তূপের উপর দিয়ে 'বাস্' চলছিল; যে কোনও মুহূর্তে সঙ্কীর্ণ পথের সীমা অতিক্রম করে, ছিটকে গিয়ে বহু নিম্নে নদীগর্ভে পড়তে পারে সে রকম আশঙ্কা খুবই ছিল। পাহাড়ী 'বাস্'-চালকের অভ্যস্ত নিপুণ হাত আর আমাদের সৌভাগ্য সেই সম্ভাব্য দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করেছে আমাদিগকে। ১১ মাইল এসে পেলাম 'অগস্ত্যমুনি'। এক ঘণ্টা লাগলো আসতে। সমুদ্রতট থেকে ৩০০০ ফিট উঁচুতে এই স্থান। সুন্দর তৃণাচ্ছাদিত সমতলভূমি। বহু লোকের বসতি, থানা প্রভৃতি এখানে আছে। তারপর ক্রমশঃ বিজয়নগর, সৌরী, চন্দ্রাপুরী প্রভৃতি ছাড়িয়ে আমরা এসে পৌঁছলাম মন্দাকিনীর পূর্বতীরে অবস্থিত কাকরাগার্ডে। 'বাস্'-যাত্রা এ পথে এইখানে শেষ হ'ল। প্রস্তুত হচ্ছে দেখলাম পাহাড় ভেঙে আরও এগিয়ে যাবার প্রশস্ত পথ। গুপ্তকাশী পর্যন্ত নাকি শীঘ্রই 'বাস্' যেতে পারবে বলে শোনা গেল।

এখন এইখানেই নেমে পদব্রজে নদীর পুল পার হয়ে ওপারে 'কুণ্ড' চটিতে এসে আমরা আশ্রয় নিলাম। বেশ মেঘ জমে একটু পরেই এক পসলা বৃষ্টি হ'ল। তখন অবশ্য আমরা চটির দোতলায় আশ্রয় পেয়েছি।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে ২১ মাইল এলাম। স্থানটি নিতান্ত ক্ষুদ্র। মাত্র দুই-তিনটি চটি আছে। পূর্বেই বলেছি চটিতে মাটির ঘর, দোতলা, কিন্তু দরজা-জানালা থাকে না। তিনদিকে দেওয়াল, সামনে খোলা। উপরে কাঠ ও পাথরের আচ্ছাদন। দোতলার ডানপাশের ঘরে আমরা বিছানা খুলে পেতে নিলাম। বৃষ্টির ছাট আসছিল বলে সামনের দিকে দড়ি টাঙিয়ে কম্বল ঝুলিয়ে দিলাম।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি। বসে বসে কথাবার্তা চলেছে এমন সময় পদভারে

ঘর কাঁপিয়ে কলকাতার জুয়েলার মশাই সদলবলে উপস্থিত হলেন। তাঁরা পিছনের 'বাসে' এলেন। একটু দেরিতে। এসেই অসঙ্কোচে আমাদের পাতা বিছানার উপর দিয়ে কাদামাখা জুতা সমেত দাঁড়ালেন, আমাদের টাঙানো কম্বল দুখানি টেনে খুলে ফেলতে চেষ্টা করলেন। এবং সেই সঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক রুক্ষস্বরে 'কুণ্ডু স্পেশালে'র ম্যানেজারকে উদ্দেশ করে ভূতপূর্ব ও বর্তমান উভয়বিধ 'রাজভাষা'র সংমিশ্রণে গালাগালি দিতে লাগলেন।

বেচারী বাদলচন্দ্র যত বলে যে এর চেয়ে ভল ঘর এখানে পাওয়া যায় না, ততই এঁর কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে ওঠে। বাদলচন্দ্রের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বিস্ময়-জনক।

আমি সে গুণে বঞ্চিত। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার দীর্ঘকালের অভ্যাসে আমি জুয়েলার মশাইকে তাঁর ঔদ্ধত্য সংযত করতে এবং তাঁর কর্দমাক্ত জুতা সমেত শ্রীচরণযুগল তৎক্ষণাৎ আমাদের পাতা বিছানা থেকে অপসারিত করতে কঠিন কণ্ঠে নির্দেশ দিয়েছিলাম; তা তাঁর প্রাপ্য বলেই মনে হয়েছিল এবং তার চেয়ে কমে তিনি নিবৃত্ত হতেন না।

একটু হকচকিয়ে গিয়ে ভদ্রলোক তাঁর ঘাড় অতি কষ্টে ঘুরিয়ে আমাকে একবার দেখে নিলেন; কিন্তু নির্দেশ ঠিকভাবে প্রদত্ত হলে কোনও অন্যায়-কারী তা অবহেলা করতে পারে না; উনিও পারলেন না। তৎক্ষণাৎ স্থান-ত্যাগ করলেন। করলেন বলে করলেন। একেবারে সে চটিতেই থাকলেন না। অন্য একটা চটি খুঁজে নিয়ে তার নিচের তলায় সপরিবারে ও স-আয়ার রাত্রিবাস করলেন। ভালই হ'ল। সকলেই স্বস্তি বোধ করলো। যথা সময়ে কুণ্ড-স্পেশালের তত্ত্বাবধানে রাত্রের আহার শেষ করে আরামে সুখ-সুপ্তিতে আমাদের রাত কেটে গেল। পরদিন সকাল থেকে হাঁটাপথে যেতে হবে। যন্ত্রযানের বিরতি। বাকী ২৯ মাইল পথ, হয় পদব্রজে, না হয় অশ্বারোহণে কিংবা কাণ্ডী অথবা ডাণ্ডীতে বাহিত হয়ে যেতে হবে। চড়াই উৎরাই, দুই-ই বেশ কষ্টসাধ্য। কেদারনাথ আছেন সেই কষ্টসাধ্য দুর্গম পথের শেষে, সমুদ্রতট থেকে ১১,৪৭০ ফিট উঁচুতে কেদারনাথ পর্বতমূলে।

॥ পর্বতারোহণ—হাঁটাপথে ॥

পদব্রজে যাওয়ার একটা নিজস্ব আনন্দ আছে। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ডাক্তারের নিষেধ আমাকে নিবৃত্ত করলো সেই আনন্দ লাভ থেকে। অশ্বারোহণেও সাহস হ'ল না। কাণ্ডী হচ্ছে সরু ঝুড়ির মত, একজন বাহকের পিঠে আবদ্ধ থাকে, চওড়া ফিতে দিয়ে বাহকের কপালে বাঁধা অবস্থায়। যাত্রী তার ভিতরে চেয়ারে বসার মত বসেন আর কাণ্ডীবাহক তার মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে যখন চলতে থাকে তখন যাত্রীর মুখ ঘুরে যায় আকাশের দিকে। হাঁটার কষ্ট বাঁচলেও ঐ অবস্থা অত্যন্ত অস্বস্তিকর। খরচ তাতে অনেক কম লাগে। ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া অনেক ভাল। বিভিন্ন বয়সের অনেক মেয়ে-পুরুষকে পরে দেখলাম অশ্বপৃষ্ঠে যেতে।

আমাদের কিন্তু ডাণ্ডী নেওয়া স্থির হ'ল। ডাণ্ডীর ভাড়া সব চেয়ে বেশী। কেদার ও বদরী দুই জায়গায় যাওয়া আসা বাবদ প্রত্যেকে ডাণ্ডীর জন্য দিতে হ'ল ৬৫০৲ টাকা। চারজন করে বাহক থাকে। ছোট নৌকার আকারে হাত তিন লম্বা, এক হাত চওড়া, একহাত গভীর। চীড় গাছের হালকা অথচ মজবুত কাঠের বাক্সর মত এই ডাণ্ডী। বসবার জায়গা ছোট তক্তা দিয়ে উঁচু করা, সামনে পা ছড়িয়ে বসা চলে। ছোট বাস্কেট, জলের ফ্লাস্ক, ছাতা লাঠি প্রভৃতিও সঙ্গে নেওয়া চলে। সামনে ও পিছনে দুটি লম্বা কাঠের ডাণ্ডা মজবুত দড়ি দিয়ে আল্‌গা ভাবে বাঁধা থাকে। সেই কাঠের ডাণ্ডা কাঁধে নিয়ে সামনে দুজন ও পিছনে দুজন বাহক অবিশ্রান্ত দক্ষতার সঙ্গে যাত্রীকে সর্বত্র বহন করে নিয়ে যায়। কী খাড়া চড়াই, কী উৎরাই কোথাও তাদের গতি ব্যাহত হয় না।

ডাণ্ডী ও কুলী এজেন্সী আছে দেখলাম। নাম বনোয়ারীলাল বেহারীলাল। তাঁদের কর্মচারী এসে হাজির হলেন ছাপানো চুক্তিপত্র নিয়ে। মাল বহার জন্য কুলী ভাড়া সমস্ত পথ যাতায়াতে সের প্রতি ২।০ লাগলো। প্রত্যেক যাত্রীদলের মাল পৃথক পৃথক ওজন করা হ'ল। অশ্বতরের পিঠে বেঁধে বা কুলীর মাথায় দিয়ে যেমন করেও হোক তারা বহন করার দায়িত্ব নিলো। কুণ্ডু স্পেশালের ম্যানেজার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। আমাদের যার যা টাকা-কড়িও তাঁর কাছে ট্রেনে উঠেই জমা দেওয়া হয়েছিল। আমাদের কাছে

একখানি করে তার রসিদ ছিল। খরচ যেমন যেমন হচ্ছিল তার পিছনে লিখে দিচ্ছিলেন।

১৩ই মে মঙ্গলবার সকাল সাতটায় যে যার স্থিরীকৃত যান, বাহন বা পদব্রজে 'কুণ্ড' চটি থেকে রওনা হলাম কেদারের পথে। সামনেই কয়েক মাইল খাড়া চড়াই পথ। ভীষণ কষ্টসাধ্য ও বিপদ্জনক।

সকাল আটটায় পৌঁছলাম গুপ্তকাশী। সমুদ্রতট থেকে ৪,৮০০ ফিট উঁচু। সুন্দর শহর। মন্দিরের ঠিক সামনেই এক চটিতে আমাদের স্থান হয়েছিল। রাস্তা থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণ। মধ্যস্থলে এক নাতিবৃহৎ কুণ্ড, তাতে দুপাশে দুটি জলধারা এসে পড়ছে। একটি প্রস্তরনির্মিত গোমুখ দিয়ে, অপরটি হস্তীমুখ দিয়ে। নাম গঙ্গা ও যমুনা। এই কুণ্ডের পুণ্যসলিলে অনেকেই স্নান করলেন। মন্দিরের অভ্যন্তরে চন্দ্রশেখর মহাদেব এবং অর্ধনারীশ্বর মূর্তি বিরাজমান। প্রাঙ্গণে প্রবেশ-পথের দক্ষিণ পার্শ্বে এক উচ্চ বেদীতে পঞ্চপাণ্ডব, ধর্মরাজ, বিষ্ণু ভগবান, মর্মর নির্মিত গৌরীশঙ্কর, নটরাজ প্রভৃতির মূর্তি সংস্থাপিত আছে। এক পার্শ্বে পাঁচটি ভীমকায় গদা রক্ষিত আছে। মন্দিরপ্রাঙ্গণে পাণ্ডার দল সারি সারি বসে গিয়েছেন দেখলাম। যাত্রীদের কাছ থেকে স-বস্ত্র ভোজ্যস্থালী ও আস্ত নারিকেল শাঁসের ভিতরে রাখা গুপ্তদান (স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমাণিক্য) গ্রহণ করে তাঁদের সুদুর্লভ পুণ্য সঞ্চয়ে সহায়তা করছেন।

এই গুপ্তকাশী এক মহাতীর্থ। কথিত আছে স্বজন-হত্যা পাপের জন্য পঞ্চপাণ্ডবকে দর্শন দেবেন না ইচ্ছা করে বিশ্বনাথ নাকি এখানে এসে দুর্গম পাহাড়ে লুকিয়ে গিয়েছিলেন; তাই এইস্থানের নাম গুপ্তকাশী। কাহিনী, বিশেষতঃ তীর্থস্থানের, বিচার করতে যাওয়া বা ঐ বিচারে যুক্তির অবতারণা করা, মনে হয় অনুচিত। তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে একমাত্র প্রয়োজন ভক্তির। যুক্তির স্থান তাতে নেই। ভক্তের ভক্তিই তার তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত করে, যার সহায়তায় সাধারণ দৃষ্টিপথের বহির্ভূত অনেক কিছু দেখতে ও জানতে পারা তার পক্ষে সম্ভব হয়। অপরের পক্ষে তা হয় না।

শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার বাণী:—"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়াশক্য অহম্ এবম্বিধোঽর্জ্জুন, জ্ঞাতুং, দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপঃ।" অনন্যা ভক্তির সহায়তায় লোকে শ্রীভগবানকে জানতে ও দেখতে পায়। দেখতে পায় অন্তরে—তত্ত্ব উপলব্ধির দ্বারা। সে দেখার জন্য দরকার যুক্তি-তর্ক-হীন বিশ্বাস, দরকার অনন্যা ভক্তি।

ভক্ত কবি দিলীপ রায় গেয়েছেন, "বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম, আমি মানি তাই জানি; অন্তরে তাঁর বাঁশরী শুনি।" মেনে নিলেই পাওয়া যায়। নইলে বিশ্বনাথ, যিনি আশুতোষ, তিনি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত ও অনুগত, ধর্ম-প্রাণ পাণ্ডবদের প্রতি কেনই বা হলেন বিরূপ, কেন তাদের দর্শন দিতে তাঁর অনিচ্ছা হ'ল, কেনই বা পশ্চাদ্-ধাবিত হয়ে শেষ পর্যন্ত কেদারনাথ পর্বতের পাদ-মূলে পেঁাছে অনন্যোপায় হয়ে তাঁকে মহিষের মূর্তি ধারণ করতে হয়েছিল এবং আত্মগোপনের ইচ্ছায় পাহাড় ভেদ করে ভূগর্ভে প্রবেশ করেছিলেন, যার ফলে নেপালে বিনির্গত হ'ল তাঁর মহিষের মুখ আর কেদারে থাকলো সেই মহিষ মূর্তির পশ্চাৎভাগ যেখানে ক্রুদ্ধ ভীম ভীমপরাক্রমে প্রচণ্ড গদাঘাত করেছিলেন —এসব কাহিনী সাধারণ যুক্তিতর্ক ও আলোচনার অতীত। সহস্র সহস্র নর-নারী যুগ যুগ ধরে এই কাহিনী শুনে আসছে, বিশ্বাস করছে, বিশ্বাস করে আনন্দ ও তৃপ্তি পাচ্ছে। আর কি চাই ?

এই গুপ্তকাশীতে খোঁজ করে দেখা করলাম শ্রীশ্রীকেদারের পাণ্ডা শ্রীনাগেশ্বর শুক্লের পিতা সৌম্যদর্শন পণ্ডিত শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রসাদ শুক্লের সঙ্গে। অতি অমায়িক তাঁর কথাবার্তা ও ব্যবহার। এখানকার যা কিছু অবশ্যকৃত্য তা তিনি সম্পন্ন করিয়ে দিয়ে পদব্রজে এগিয়ে গেলেন কেদার অভিমুখে। সেখানে আবার দেখা হবে। এঁর ঠিকানা দিয়েছিলেন আমার এক জ্ঞাতি খুল্লতাত শ্রীদেবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি গত বৎসর তাঁর বৃদ্ধা মাতাকে হরিদ্বার নিয়ে গিয়েছিলেন কুম্ভস্নান করাতে এবং সেখান থেকে গিয়েছিলেন শ্রীশ্রীকেদার-বদরী তীর্থদর্শনে। আমার জানা মতে আমাদের বংশে তিনিই ঐ পথে অগ্রগামী। কুম্ভস্নানে সেবার আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী অমলাও গিয়েছিলেন; কিন্তু সেবার তাঁর কেদার-বদরী যাওয়া হয়নি। এবার একসঙ্গে গেলাম।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর প্রায় দেড়টায় আমরা গুপ্তকাশী থেকে রওনা হলাম। পরবর্তী নির্ধারিত 'ফাটা' চটিতে পৌছলাম বিকেল সাড়ে চারটায়। পথে উল্লেখযোগ্য মৈখণ্ডা বা দেবী মহিষমর্দিনীর ছোট এক মন্দির দেখলাম। কিন্তু তখন খুব মেঘ করেছিল; ঝড়বৃষ্টির ভয়ে ডাণ্ডীবাহকরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। ফলে যাবার পথে ঐ দেবীদর্শন হ'ল না। ফিরবার পথে হয়েছিল। ছোট ঘরের ভিতরে পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত আছে কতকগুলি মূর্তি। আরও ভিতরে দক্ষিণ পাশে গুহার মত এক কক্ষে সাজানো রয়েছে উজ্জ্বল ধাতুনির্মিত বড় বড়

নয়টি মুখ। এর তাৎপর্য জানতে পারা গেল না। মনে হ'ল নারীমুখ। পুরোহিত মশাই পূজার পয়সা নিলেন, নির্মাল্য দিলেন গোলাপ ফুল ও হোমের বিভূতি। কিন্তু তিনি যা বললেন তার কিছুই বুঝতে পারলাম না। বাইরে এক বিরাট দোলনা দেখা গেল। দেবী মহিষমর্দিনীর ঝুলন উৎসব হয় ঐ দোলনায়। মানব-দেহ-ধারিণী অনেক দেবী সেই দোলনায় দোল খেলেন। মহিষমর্দিনীর গুণ ও শক্তি অর্জনের প্রয়োজন নিশ্চয়ই তাঁদের আছে। যা দিনকাল পড়েছে তাতে শক্তি অর্জনের খুবই দরকার। দোল খাওয়ার পুণ্যের জন্য দক্ষিণা আদায় করার লোক সেখানে মোতায়েন ছিল। বিনামূল্যে কি কিছু হয়? হয় না।

এসব পরের কথা। ফিরবার সময়ের কথা।

এখন আমরা মৈখণ্ডার পাশ দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলাম। পথে অল্পক্ষণ অল্প অল্প বৃষ্টি হয়েছিল। ঝড় হয়নি। বৃষ্টির জন্য কোনও অসুবিধা হয়নি। অনেকের লেখা কেদার-বদরী ভ্রমণকাহিনী পড়েছি। প্রায় সবগুলিতেই ঝড়-বৃষ্টিতে নিদারুণ কষ্ট পাওয়ার কথা উল্লেখ করা আছে। আমাদের অভাবনীয় সৌভাগ্য যে কোনও দিন ঝড়বৃষ্টিতে বিপন্ন হতে হয়নি। বৃষ্টি দুই-তিন দিন হয়েছিল। তা চটিতে ও যাত্রীভবনে আশ্রয় নেবার পরে।

১৪ই মে মঙ্গলবার রাত্রিবাস করতে হ'ল 'ফাটা' চটিতে। কেন যে এমন সুন্দর পরিচ্ছন্ন স্থানের নাম 'ফাটা' হ'ল তা জানা গেল না। এখানকার চটির ঘরগুলি বেশ ভালো। ঘরে দরজা-জানালা আছে। সামনে দোকান বাজার জমজমাট। পান-চাক্কি অর্থাৎ ঝরনার জলস্রোতে পরিচালিত গম-পেষণের চাকি অনেকগুলি আছে এখানে। ফিরবার সময়েও একরাত্রি এখানে আমাদের থাকতে হয়েছিল। বড় বড় দোকান আছে দেখলাম। সেখানে জামা, কাপড়, কম্বল, প্রসাধন সামগ্রী, সেফটি রেজারের ব্লেড, তারপর চাল, ডাল, মশলা সাজানো রয়েছে। যাকে বলে 'ভেরাইটি স্টোর'। এক দোকানের মালিকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁর নাম 'বালকরাম'। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে তিনি বালক ছিলেন। সদালাপী লোক। কলকাতার উমাপ্রসাদ মুখার্জিকে আমি চিনি কিনা এবং তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করলেন। এ পথে রমাপ্রসাদবাবু ও উমাপ্রসাদবাবু দেখলাম সুপরিচিত। বর্ণাঢ্য বসন পরিহিতা প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার বিভূষিতা শিউরতন গৃহিণী দোকানে দোকানে বিশেষ সমাদর লাভ করলেন দেখলাম। সকলকে সরিয়ে দিয়ে দোকানদার তাঁকে খাতির দেখাতে লাগলো। খুবই স্বাভাবিক। আগে দর্শনধারী তবে তো

গুণবিচারি। সাজপোশাক ঠিকমত না থাকলে খাতির পাওয়া যায় না। একথা খুবই ঠিক।

পরদিন ১৫ই মে বুধবার যথারীতি গরম গরম সিঙ্গাড়া সহ চা পান করে আমরা রওনা হলাম। গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে পার্বত্যপথ চলেছে এঁকে-বেঁকে। কখনও চড়াই, কখনও উৎরাই। বামদিকে গগনচুম্বী পর্বতগাত্র। বিচিত্র তার বর্ণসম্পদ। কোথাও রক্তাভ, কোথাও ঘনকৃষ্ণ, কোথাও শ্লেট-রং, আবার কোথাও বা তুষার-শুভ্র। কত নাম-না-জানা গাছ ; কত বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটে আছে পাহাড়ের গায়ে। খুব বড বড় গাছে দেখা গেল টকটকে লাল থোকা থোকা ফুল ফুটে আছে। নাম শুনলাম 'বুরাস' ফুল। শতাধিক হাত দীর্ঘ, বিশাল-পরিধি চীড় বৃক্ষের শ্রেণী ঊর্ধ্বলোকের নীরব ইঙ্গিত বহন করে দণ্ডায়মান। ডানদিকে হাজার হাজার ফুট নীচে নীলাভ স্বচ্ছ-সলিলা খরস্রোতা মন্দাকিনী এক অপূর্ব অস্ফুট সঙ্গীতে দিঙমণ্ডল মুখরিত করে প্রবাহিতা। কী তার তীব্র গতিবেগ! কী তার প্রাণমাতানো কল-ঝঙ্কার!

কিছুক্ষণের মধ্যে 'বাদলপুর' ছাড়িয়ে সকাল প্রায় নয়টায় আমরা এসে পৌছলাম 'রামপুরে'। বেশ বড় জায়গা। প্রায় পনেরোটি চটি ও ধর্মশালা আছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে স্নানাহার সেরে নিয়ে দুপুর সাড়ে বারটায় আবার রওনা হ'লাম। সারাপথ প্রত্যেক চটি বা ধর্মশালায় আমরা পৌছবার আগেই পাচক ও পরিচারক দল ছড়িদার শ্রীপাল সিং-এর সঙ্গে লঘু পায়ে এগিয়ে গিয়ে রন্ধনাদি আরম্ভ করেছে। বাসস্থান ও আহারের জন্য কোথাও আমাদের কোনও বেগ পেতে হয়নি। সর্বত্র সুস্বাদু ও সুপাচ্য ভোজ্য পেয়েছি যথাসময়ে দিনে রাতে। বুগু স্পেশালের ব্যবস্থাপনা খুবই প্রশংসনীয়।

॥ ত্রিযুগীনারায়ণ ॥

'রামপুরে'র পর দেখলাম 'সীতাপুর' রয়েছে। সঙ্গতিহানি হয়নি। রামের পরই সীতা আছে। এইবার খাড়া চড়াই পথে উঠতে হ'ল। সমুদ্রতট থেকে ৭০০০ ফিট উঁচুতে সুবিখ্যাত 'ত্রিযুগীনারায়ণ' এসে পৌছলাম বিকেল তিনটায়। পথে 'শাকম্ভরী' দেবীর মন্দির। দর্শনীয় মনোরম স্থান। সুন্দর

শীতল জলের ঝর্ণা নেমে আসছে পাশেই। উন্মুক্ত ঝর্ণার জল পান না করে উত্তর প্রদেশ সরকার পাহাড়ের গায়ে যে সব নল বসিয়েছেন সেই নলের জল পান করার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ-জ্ঞাপক হিন্দী ভাষায় প্রাচীর-লিপি রয়েছে দেখা গেল পর্বত-গাত্রে বহু স্থানে।

ত্রিযুগীনারায়ণ সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। তিন যুগ ধরে নারায়ণ এখানে বিরাজমান। এমন সুন্দর স্থানে যদি না থাকবেন তাহলে আর কোথায় থাকবেন? সর্বত্রই তিনি আছেন তা ঠিকই। তবু তাঁর আনন্দময় সত্তা সেইখানেই অধিকতর অনুভূত হয় যেখানে মানবমন প্রাকৃতিক প্রভাবে সর্বাধিক আনন্দ পায়। এও এক পর্বতচূড়া। চারিদিকে উচ্চ পর্বতমালা একে ঘিরে রেখেছে। দূরে তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ এবং তৎসংলগ্ন সঞ্চরণশীল কাজল-কালো মেঘের দল অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের রক্তিম কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে এক অপূর্ব স্বর্গীয় সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল। সে দৃশ্য অবিস্মরণীয়।

এখানে মন্দির ঘিরে দোকান বাজার রয়েছে। রয়েছে ডাকঘর। এক পাশে বাবা কালী-কমলিওয়ালার সুপ্রশস্ত পাকা দ্বিতল ধর্মশালা। খুব সুন্দর ব্যবস্থা। ধর্মশালার রক্ষক অতি সজ্জন অমায়িক ব্যক্তি। ভাল তো সবই ভাল। আমরা স্বেচ্ছায় নীচের তলার ঘরে থাকলাম। দোতলায় গেলাম না। এখানে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হতে লাগলো। স্থানীয় পাণ্ডা শ্রীমায়ারাম ও শ্রীকেবল-রাম আমাদের জন্য ঘরের মেঝেয় সতরঞ্চি ও পুরু গালিচা পাতিয়ে দিলেন। গায়ে দেবার জন্য অনেক লেপও এনে দিলেন। রাত্রে সেগুলির খুবই প্রয়োজন বোধ হয়েছিল। ঠাণ্ডার প্রকোপ প্রচণ্ড। সন্ধ্যার পূর্বে আশেপাশে দেখে বেড়ালাম। দোকান থেকে মূর্তি-সম্বলিত তামার পাত ছোট বড় অনেক-গুলি স্মারক হিসাবে কেনা হ'ল। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে গম ও যবের চাষ। কী সুন্দর স্বাস্থ্য এখানে পুরুষ ও মেয়েদের। দুধে-আলতা রং মেয়েরা অক্লান্তভাবে কাজ করে যায় ক্ষেতে; ভারী বোঝা মাথায় নিয়ে অবলীলাক্রমে যাতায়াত করে সঙ্কীর্ণ খাড়াই পাহাড়ী পথে।

পথে ও ধর্মশালার উঠানে দেখলাম কয়েকটি বিশাল দেহ লোমশ সারমেয় ঘোরাফেরা করছে। কী সুন্দর সোনালী রং তাদের গায়ে। শক্তিমান সুগঠিত দেহ কিন্তু শান্ত গম্ভীর তাদের প্রকৃতি। অকারণ উত্তেজনা নেই; নেই তাদের কলহ বা কর্কশ নিনাদ। মনে হ'ল স্থান-মাহাত্ম্য। সন্ধ্যার পর মন্দিরে গিয়ে আরতি দেখলাম।

নাটমন্দিরে এক অনির্বাণ যজ্ঞ-কুণ্ড রয়েছে। তিন যুগ ধরে তাতে অগ্নি প্রজ্বলিত আছে। পার্শ্বে রক্ষিত কাষ্ঠস্তূপ থেকে ভক্ত যাত্রীরা সাধ্যমত মূল্যের কাষ্ঠ ক্রয় করে ঐ যজ্ঞকুণ্ডে প্রদান করেন। আকার অনুপাতে মূল্য। পাঁচ, দুই, এক, টাকা, আবার আট আনা চার আনারও আছে।

আমরা ত্রিযুগীনারায়ণের যথারীতি পূজা, প্রদক্ষিণ, কুণ্ডের জলস্পর্শ প্রভৃতি অবশ্য কর্তব্য সম্পন্ন করলাম। অত্যধিক ঠাণ্ডায় কুণ্ডে নেমে অবগাহন স্নানের কথা ভাবতেই পারলাম না। কিন্তু বিহার বা উত্তরপ্রদেশের কয়েকজন যাত্রী দেখলাম পরম আনন্দে কুণ্ডে নেমে অবগাহন স্নানের পুণ্য অর্জন করলেন। এই থানে নাকি হর-পার্বতীর বিবাহ হয়েছিল। সেখানে প্রশস্ত এক শিলাখণ্ড আছে। বলা হয় ধর্মশিলা। কল্পনা নেত্রে বুঝি দেখতে পাওয়া যায় তপঃক্লিষ্টা পার্বতী যেন ঐ শিলাসনে উপবিষ্টা, দেবাদিদেব ভোলানাথ শিবের প্রতীক্ষায়। ভক্তিমতী নারীযাত্রী ঐ শিলাখণ্ডে বসে যথাবিহিত মন্ত্র উচ্চারণ করে ভোজ্য ও বস্ত্রাদি পাণ্ডাকে দান করলেন। এ নাকি করতে হয়।

মন্ত্র সংস্কৃত ও হিন্দীর সংমিশ্রণ। অনেক পণ্ডিত বা পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি মন্ত্রের নির্ভুল উচ্চারণ সম্পর্কে আপোসহীন দাবী উত্থাপন করেন। তাঁদের যুক্তি, নির্ভুল উচ্চারণেই শব্দ প্রাণময় হয়, শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ হয়! ঠিক কথা। বৈদিক বিধানে যজ্ঞাদি কার্যে যথাযথ মন্ত্রোচ্চারণে প্রত্যাশিত ফল-প্রাপ্তি হ'ত। কিন্তু বৈদিক যজ্ঞাদির যুগ দীর্ঘকাল তিরোহিত। বর্তমান যুগে ভক্তিভরে নাম-কীর্তনই যখন ভগবৎ কৃপালাভের সার্বজনীন ও সর্বোৎকৃষ্ট উপায় বলে বর্ণিত হয়, তখন ভাষার বিশুদ্ধতা ও তার উচ্চারণের নির্ভুলতার প্রতি অত্যধিক লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন কোথায়? মনে ভক্তি সঞ্চার হলে সেই ভক্তিমিশ্রিত নির্মল মনোভাবই ভগবৎ-পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। ভাব-গ্রাহী জনার্দন। এখানে মন্দিরপ্রাঙ্গণে সরস্বতী কুণ্ডে পিতৃপুরুষের তর্পণ করার বিধান আছে।

১৬ই মে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটায় ত্রিযুগীনারায়ণ থেকে অবতরণ শুরু হ'ল। উৎরাই পথ। বিপদ-সঙ্কুল। কিন্তু মনের পাত্র তৃপ্তিতে ভরপুর। কোনও রূপ আশঙ্কার স্থান নেই সেখানে। ক্রমে আমরা এসে পৌছলাম 'শোন-প্রয়াগ'। অতীব মনোরম দৃশ্য এখানে। কেউ বলেন 'বাসুকি', কেউ বলেন 'শোন', আমাদের বামদিক থেকে নেমে আসছে। ডানদিক থেকে 'মন্দাকিনী' অধীর আগ্রহে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কী আনন্দ-মুখর

সেই সম্মিলন। আশেপাশে স্তরে স্তরে প্রস্ফুটিত পার্বত্য কুসুমের সুমিষ্ট সৌরভ ঐ মিলনকে অভিনন্দিত করছে। অভিনন্দিত করছে নাম-না-জানা বিহগ-কাকলি। স্বর্গ থেকে নেমে আসছে মন্দাকিনী। ধরণীর বুকে বর্ধিত হয়েছে শোন। আত্মহারা মন্দাকিনী পর্বতের উচ্চস্তর থেকে যেন লাফিয়ে নেমে আসছে, সকল বাধা উল্লঙ্ঘন করে। পর্বতদুহিতার সেই প্রচণ্ড আবেগে শোনের পরিপূর্ণ বুকও হয়েছে চঞ্চল, মুখর। মিলনের কল-ঝঙ্কারে যেন সেই সর্বব্যাপী জগদীশ্বরের জয়গান ধ্বনিত হচ্ছিল। "ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্"—সব কিছুই আবৃত করে বিরাজিত সেই এক পরমেশ্বর। সর্বত্র প্রকাশিত তাঁর মহিমা, ধ্বনিত তাঁর জয়গান। তাঁরই কৃপায় ধন্য হলাম এই অনুভূতি লাভ করে।

এখন আমরা বহু নিম্নে প্রায় ধরণীর বুকে নেমে এসেছি। এক লৌহ-সেতুর উপর দিয়ে শোন-প্রয়াগের অপর পারে এলাম। ১৯১৩ সালে এই সেতু নির্মিত হয়েছে। এবার আবার চড়াই পথে আরোহণ। ঐ পথে গৌরী-কুণ্ডে এসে পৌঁছলাম সকাল প্রায় দশটায়।

॥ গৌরীকুণ্ড ॥

গৌরীকুণ্ডের উচ্চতা সমুদ্রতট থেকে ৬,৫০০ ফিট। এখানে যে ধর্মশালায় আমরা আশ্রয় পেলাম তার ঠিক নীচেই কল-নাদিনী মন্দাকিনী বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উপলখণ্ডের কঠিন হস্তের বাধা লঙ্ঘন করে ক্রমশঃ ঢালু পথে নেমে আসছে; ক্ষুব্ধ গর্জনে অধীর চঞ্চল। ফেনিল তার স্বতঃস্ফুরিত উচ্ছ্বাস। আঁকা-বাঁকা পথে উচ্ছল হয়ে এগিয়ে চলেছে জলধারা। চলেছে ধরণীর প্রান্তে কোন্ রত্নাকরের সন্ধানে? রবীন্দ্রনাথ কবিতার ছন্দে এরই কি রূপ-বর্ণনায় লিখেছিলেন,—

"এড়ায়ে যাবে বলি,
কত না আঁকা-বাঁকার পথে, চলে সে ছলছলি!"

এখানে নদীগর্ভে এক কৌতুকপ্রদ দৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দেখা গেল এক গোলাকার শিলা জলে ভাসছে, স্রোততাড়িত হয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। মন্দাকিনীর স্বচ্ছ নীল জলধারা যেখানে উপরদিক থেকে নেমে

আসছে বড় বড় পাথর টপকে, সেখানে কতকগুলি পাথরের বেষ্টনীর ভিতর জলে আটক পড়ে গিয়েছিল স্রোতে ভেসে আসা একটা ফুটবলের মত গোল পাথর। জলের ধাক্কায় এদিক থেকে সেদিক তাড়িত হচ্ছে, বার হতে পারছিল না। জলের ধারে নেমে গিয়ে দেখলাম সেই গোলাকার পাথরটি, বহু-ছিদ্রবিশিষ্ট স্পঞ্জের মত তার গাত্র। জলে ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছিল, ভিতরে বায়ু থাকায় জলে ভেসে ছিল।

মনে পড়ে গেল এমনি একখানি ছোট স্পঞ্জের মত পাথর এক কৃত্রিম জলাধারে রক্ষিত আছে দেখেছি লছমনঝুলার অপর পারে যে নূতন "পরমার্থ-নিকেতন" নাম দিয়ে ব্যবসায়ীর ঐশ্বর্যের প্রদর্শনীস্বরূপ সুবিস্তৃত হর্ম্যরাজি নির্মিত হয়েছে, তারই সংলগ্ন এক উদ্যান-বাটিকায়। কৃত্রিম জলাধারের তল-দেশে সেই পাথরটি পড়ে থাকে; জলাধারের গাত্র-সংলগ্ন নলের ভিতর দিয়ে জলপূর্ণ করালে পাথরটি জলের উপর ভেসে ওঠে। অলৌকিক কিছু মনে করে কত যাত্রী সেখানে জলাধারের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেন দেখেছি। কেউ কেউ প্রণামীও দেন। ভালই তো। যেখানেই যা দেওয়া হোক না কেন, শ্রদ্ধাভরে দিলে ঠিক জায়গায় তা পৌছে যায়। তবে ঐ পরমার্থ-নিকেতন আমার ভাল লাগেনি; বে-মানান মনে হয়েছিল। ঐ নিকেতন নির্মিত হওয়ার আগে দেখেছি ঐ স্থান ছিল নির্জন শান্তিপূর্ণ। "স্বর্গদ্বার"কে স্বর্গের দ্বার বলেই তখন মনে হ'ত। বহু সিদ্ধ-যোগীর সাধনপীঠ ছিল আশেপাশে।

যাক, এসব কথা। এখন গৌরীকুণ্ডে এসে গৌরীকুণ্ডের কথা বলি। এ বেশ বড় শহর। বহু দোকানপাট। দুটি কুণ্ড আছে। একটি উষ্ণ জলের। অপরটি শীতল জলের। শেষেরটিতে হরিদ্রা বর্ণের জল। এখানে নাকি গৌরীদেবী ঋতুস্নান করেছিলেন। গৌরীদেবীর এক মন্দির আছে কুণ্ডের সন্নিকটে। তপ্ত কুণ্ডে অনেকে স্নান করতে নামলেন। জল কিন্তু ভীষণ গরম; প্রায় অসহনীয়। অনেক তীর্থযাত্রী এখানে মস্তক-মুণ্ডন করেন দেখলাম। সারিবদ্ধ ক্ষৌরকারের দল কর্মতৎপর।

স্নানাহারের পর মধ্যাহ্নে আমরা গৌরীকুণ্ড থেকে অগ্রসর হলাম। পথ ক্রমশঃ ঊর্ধ্বগামী। কিছুদূর এসে দেখা গেল পথের বাঁকে ছোট একটু ঘরে রয়েছেন এক প্রস্তরমূর্তি, 'চীরবাসা ভৈরব'। তাঁর সেই মন্দির-ঘরের সামনে বারান্দায় একটা দড়িতে ছোট ছোট ছিন্ন বস্ত্রের টুকরা। এ নাকি এখানে দিতে হয়। এঁর পূজায় ছিন্ন বস্ত্রের টুকরাই একমাত্র উপকরণ। এবং

তা দিলে সফল হয় কেদারনাথ দর্শন। ভাবলাম, এর অর্থ কি? মনে হ'ল এ যেন সর্বস্ব ত্যাগের ইঙ্গিত। এতটা পথ, দুর্গম পথ আসতে আসতে মানুষ ক্রমশঃ হালকা হয়ে আসে; অনেক বা সব বোঝা নেমে যায়; থাকে হয়ত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লজ্জা নিবারণের পরিধেয় বস্ত্রটুকু। সেই শেষ সম্বল এই চীর-বাসা ভৈরবের কাছে অর্পণ বা পরিত্যাগ করতে সমর্থ হলে, তবেই বুঝি সকল পার্থিব বোধের অতীত দেবাদিদেব কেদারনাথের মহিমা উপলব্ধ হয়। চীরবাসা ভৈরবকে ছিন্ন বস্ত্র প্রদানের তাৎপর্য এই মনে হ'ল। সব ছাড়তে না পারলে তো তাঁকে পাওয়া যায় না। যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যাঁকে পেলে অপর সকল প্রাপ্তিই নিরর্থক হয়ে যায় তাঁর দাবী তো বড় কম নয়। পরিপূর্ণ রূপে সর্বস্ব ত্যাগ না হ'লে তিনি তো ধরা দেন না। মনের সিংহাসন একেবারে নিঝঞ্ঝাট ও ফাঁকা না হলে কোথায় এসে বসবেন তিনি? আর মনের মণিকোঠায় যদি তাঁকে বসাতে না পারা গেল কী হবে চর্মচক্ষুতে তাঁর বিগ্রহ দেখে বাইরের দেবালয়ে? তাই বুঝি এই মহাপ্রস্থানের পথে পথের ধারে ভৈরবকে শেষ সম্বল ছিন্ন বস্ত্রটুকু দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। শ্রীশ্রীকেদারনাথকে দেবার জন্য থাকবে তখন শুধু মাত্র অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্য, আর সর্বভার-বিনির্মুক্ত দেহটুকু। আগেকার দিনে লোকে দিতও তাই। আর ফিরে আসত না। হিমালয়ের এই মহাতীর্থ-দর্শন করে আর প্রত্যাবর্তন করার ইচ্ছা হ'ত না পঙ্কিল ধরণীর ক্লেদ-কুণ্ডে, শোক-তাপ-জর্জরিত সংসারের মালিন্যের মধ্যে।

সমুদ্রতট থেকে ৭,০০০ ফিট উঁচুতে এই চীরবাসা ভৈরবের মন্দির। আরও উঁচুতে আমরা উঠছি। ৮,০০০ ফিট উঁচুতে পেলাম 'জঙ্গল-চটি'। চারিদিকে সুগভীর জঙ্গল। অরণ্যের নিবিড় শৈত্য চারিদিক থেকে নেমে আসছিল। কিছু পথ জমাট বরফের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হ'ল। বিকেল তিনটায় এসে পৌছলাম কেদারের পথে শেষ চটি 'রামাবারা'য়—সমুদ্রতট থেকে ৯,০০০ ফিট উঁচুতে। খুব ঠাণ্ডা বোধ হতে লাগলো। নির্জন স্থান। সামান্য কয়েকখানি বাড়ি ও দোকান। এক দোকান থেকে লেপ ভাড়া করে আনা হ'ল। কম্বলে শীত প্রতিরোধ করা রাত্রে সম্ভব হবে বলে মনে হ'ল না। ভালই হয়েছিল লেপ সংগ্রহ করা। বেশ আরামে মাটির দোতলায় অন্ধকার ছোট্ট ঘরে আপাদমস্তক কম্বল ও লেপ ঢাকা দিয়ে রাত্রি যাপন করা গেল।

॥ কেদার-দর্শন ও রুদ্রপ্রয়াগে প্রত্যাবর্তন ॥

পরদিন ১৭ই মে শুক্রবার প্রত্যুষে আমরা অধীর আগ্রহে রওনা হলাম শ্রীশ্রীকেদার অভিমুখে। আর মাত্র সাড়ে তিন মাইল পথ অতিক্রম করতে পারলেই বহু আকাঙ্ক্ষিত, দেবতাত্মা হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ তীর্থ শ্রীশ্রীকেদারনাথের শ্রীমন্দির। এই পথটুকু কিন্তু সমস্তটাই খাড়া চড়াই। যত দুর্গম, তত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মনোমুগ্ধকর। পাহাড়ের গায়ে স্নিগ্ধ বরফের আবরণ প্রভাতী রৌদ্রে সমুজ্জ্বল। জমাট বরফের উপর দিয়ে আমাদের যেতে হচ্ছিল। খুব সন্তর্পণে লোহার সূচালো অগ্রভাগ-যুক্ত লাঠি সেই বরফের উপর ঠুকতে ঠুকতে আমরা পদব্রজে যাচ্ছিলাম ঐ পথটুকু। আমাদের ডাণ্ডীবাহকরা হয়েছিল পথ-প্রদর্শক। কোথাও যদি নীচের বরফ কোনও কারণে গলে গিয়ে থাকে তাহলে হঠাৎ তার ভিতরে পা বসে যেতে পারে; তাই সতর্ক হয়ে যেতে হয়। ভারী ভাল লাগছিল ঐ বরফের উপর দিয়ে যেতে।

আমাদের ডানদিকে খানিকটা নীচে খরস্রোতা মন্দাকিনী প্রবাহিতা। মন্দাকিনীর বুকে দেখা গেল জমাট বরফের চাঁই এক-এক স্থানে যেন অবগাহন করতে নেমে এসেছে পাহাড় থেকে; নেমে এসেছে আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে; নেমে এসেছে আপন অন্তরের কাঠিন্য সূর্যতাপে বিগলিত করে মন্দাকিনীর তুষারশীতল জলধারায় নিঃশেষে মিশিয়ে দিতে। কোথাও দেখি বিরাট তুষারস্তূপের নীচে দিয়ে কুলু কুলু নাদে মন্দাকিনী আসছে নেমে। নেমে আসছে, আর যেন মৃদু গুঞ্জনে মুগ্ধস্বরে বলছে;—"যাও, এগিয়ে যাও, দেখে এসো আমি কোথা থেকে আসছি; দেখে এসো পর্বতসানুদেশে শ্রীশ্রীকেদার-নাথকে, অনুভব করে এসো তাঁর সর্বব্যাপী সত্তাকে। তাঁর সত্তা যে সর্বত্র বিদ্যমান। জড় ও চেতন সবই তাঁর বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ।"

সত্যই, অপ্রতিরোধ্য এ পথের আকর্ষণ! বিস্তীর্ণ তুষার-ক্ষেত্র অতিক্রম করে অনন্যচিত্ত হয়ে এগিয়ে চলেছি। কী স্বর্গীয় সুষমায় চারিদিক উদ্‌ভাসিত। মেঘশূন্য আকাশে সূর্যকিরণের সুদুর্লভ প্রসন্নতা। সৌভাগ্যসূচক বলে মনে হল।

১১,০০০ ফিট উঁচুতে গরুড় মহারাজের মন্দির। গরুড় মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে সকাল নটায় আমরা উপনীত হলাম শ্রীশ্রীকেদারনাথের শ্রীমন্দিরের সম্মুখে। শ্রীমন্দির প্রায় এক মাইল দূর থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পথের

উভয় পার্শ্বে বিচিত্র বর্ণের ফুলের সমারোহ। ধরণী,—পার্বত্যপথের রিক্তা নিরাভরণা ধরণী, এখানে এসে যেন রাশি রাশি ফুলের ডালা সাজিয়ে বসে আছেন। কী উল্লাস। প্রাণ-মাতানো সুরে স্বতঃস্ফূর্ত জয়ধ্বনি উঠলো যাত্রীদের কণ্ঠে। জয়, কেদারনাথজী কী জয়। এইবার কিছুটা সমতলভূমি ও তুষারক্ষেত্র পার হয়ে কাষ্ঠনির্মিত এক সেতু অতিক্রম করে আমরা এলাম মন্দাকিনীর অপর পারে, পূর্বপারে। সামনেই উচ্চ প্রশস্ত প্রস্তর-বেদীর উপর শ্রীমন্দির। সন্নিকটে যাত্রীনিবাস। সমুদ্রতট থেকে ১১, ৭৫০ ফিট উর্দ্ধে এই মন্দির। পশ্চাতে তুষারাবৃত নীলকণ্ঠ পর্বত-শৃঙ্গ বিরাজমান। ঐ শৃঙ্গের শীর্ষদেশের উচ্চতা ২১,৬৪০ ফিট। আশেপাশে পর্বতগাত্রে প্রচুর তুষারপাত হয়ে আছে। দেখলাম শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে সম্মুখে ও বামপার্শ্বে দীর্ঘাকৃতি বিশাল বরফের চাঁই লম্বমান। যেন প্রকৃতি সাষ্টাঙ্গে প্রণতা, আত্ম-সমর্পিতা। শ্রীমন্দিরের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে প্রস্তরনির্মিত বিরাট নাদেশ্বর বৃষ সংস্থাপিত রয়েছে।

প্রবেশপথে একদিকে মহাবীর, অপরদিকে পরশুরামের মূর্তি। বহির্দেশে প্রবেশদ্বারের কিছু উর্দ্ধে মন্দিরগাত্রে স্থাপিত রয়েছে মনোরম ভঙ্গীতে বংশীবাদন-রত শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। তিনি যেন বংশীধ্বনিতে আহ্বান করছেন মর্ত্যমানবকে। যেন বলছেন—"এসো, একমনে এগিয়ে চলে এসো ; দেখতে দেখতে এসো বিশ্বরূপকে। তাঁকে দেখতে পাবে পর্বতের বিশালতায় ; তাঁকে দেখবে নৃত্যচঞ্চলা কলঝঙ্কারময়ী নির্ঝরিণীর ধারায়, বিরাট মহীরুহের বিস্ময়-কর দৈর্ঘ্যে, ছায়া-সুশীতল অরণ্যের নিবিড়তায়। সর্বত্র তিনি সুপ্রকাশ। ভয়াবহ দুর্গমতায় তিনিই সঙ্গী ও সহায়। তিনিই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছেন। তুমি শুধু একান্তমনে অনন্যশরণ হয়ে এগিয়ে এসো।" এই আহ্বান তো আজকের নয়, একদিনের নয়। অনন্তকাল ধরে ধ্বনিত হয়ে আসছে, ধ্বনিত হ'তে থাকবে। এ আহ্বান একবার শুনতে পেলে সাড়া না দিয়ে থাকার উপায় নেই।

মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রথম কক্ষে রয়েছেন সিদ্ধিদাতা গণেশ, পঞ্চপাণ্ডব, কুন্তী দেবী প্রভৃতির মূর্তি। প্রস্তরনির্মিত মূর্তি। পরবর্তী কক্ষে প্রবেশপথের দুই পার্শ্বে পার্বতী দেবী ও লক্ষ্মী দেবীর মূর্তি। এইবার গর্ভ-গৃহ। অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। কী যেন একটা অলৌকিক প্রভাবে বিস্মৃত হতে হয় সব কিছু। এমন কি নিজের অস্তিত্বকেও। স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল দীপালোকে দেখা গেল এক বিশাল ত্রিকোণ প্রস্তরখণ্ডরূপে বিরাজিত আছেন দেবাদিদেব

শ্রীশ্রীকেদারনাথ। অপূর্ব এর কাহিনী। পঞ্চপাণ্ডব আসছেন মহাপ্রস্থানের পথে। জ্ঞাতিবধজনিত মহাপাপ স্খালনের আশায় তাঁরা দেবাদিদেব মহাদেবের দর্শনেচ্ছু। মহাদেব কিন্তু তাঁদের দর্শন দিতে চান না। তিনি লুকিয়ে থাকছেন; ছদ্মবেশে পালাচ্ছেন। অবশেষে মহিষের ছদ্মবেশে এইস্থানে পর্বত ভেদ করে হন অন্তর্হিত। তাঁর মহিষ-মুখ প্রকাশিত হয় নেপালে। তাঁর মহিষদেহের পশ্চাৎভাগ ক্রুদ্ধ ভীমের গদার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অসাড় হয়ে যায়। সেই পশ্চাৎভাগই এখানে শ্রীশ্রীকেদারনাথ নামে প্রসিদ্ধ ও সংপূজিত। ভীমের গদাঘাত-জনিত ক্ষতে এখনও ভক্ত যাত্রীবৃন্দ সাধ্যমত ঘৃত-প্রলেপ করেন; ভক্তি-আপ্লুত দেহে আলিঙ্গন করেন, লুটিয়ে পড়েন ঐ দেব-দেহের উপর।

জন্ম, কর্ম বা অর্থের ভিত্তিতে যে জাতিভেদ তা এখানে দেখলাম সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত। খুব ভালো লাগলো। সকলেরই এখানে সমান অধিকার এঁর কাছে যাবার, এঁকে স্পর্শ করবার, স্বহস্তে এঁর পূজা করবার। ব্রাহ্মণ-শূদ্রে ভেদ নেই, ধনী-দরিদ্রে পার্থক্য নেই। সকল ভেদাভেদ-জ্ঞান, সকল জাতিবিচার নিঃশেষে দগ্ধ হয়েছে, তারই ভস্মাবশেষ এঁর অঙ্গ-ভূষণ। বারাণসী ধামে বিশ্বনাথ মন্দিরে স্পর্শ করে পূজা করার সর্বজনীন অধিকার পাণ্ডা-পূজারীর দল একবার অস্বীকার করার ফলে প্রবল জনবিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট হয়েছিল। জনসাধারণের দাবী ও অধিকার স্বীকৃতিলাভ করেছে। শিবমন্দিরে সাধারণত স্পর্শ-বাঁচানোর বিধি-নিষেধ থাকে না। দক্ষিণ ভারতে অবশ্য তা মন্দির মাত্রেই আছে। রামেশ্বরেও আছে। পশ্চিমভারতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দিরে ১৯৫৮ সালে যে ব্যবস্থা দেখে এসেছিলাম তাতে দেব-মন্দির বলে মনে না করে কোন ঐতিহাসিক সরকারী কীর্তিস্তম্ভ বলে মনে করার কারণ হয়েছিল। তকমাধারী পাহারাওয়ালা রয়েছে, বাঁধানো খাতা নিয়ে সরকারী কর্মচারী উপবিষ্ট, তিনি পূজার উপকরণ, দক্ষিণা ইত্যাদি গ্রহণ করে খাতায় জমা করছেন; যাত্রীগণ দূর থেকে অর্থাৎ পিতল-দণ্ডের বেষ্টনীর বাইরে থেকে সোমনাথের কৃষ্ণপ্রস্তরের লিঙ্গমূর্তি দর্শন করতে অনুমতি পান। ভালো লাগেনি।

শ্রীশ্রীকেদারনাথের মন্দিরে যাত্রীদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে এবং সেজন্য রক্ষী নিযুক্ত আছে। তা থাকা দরকার। কিন্তু তাছাড়া আর কোনও নিষেধের বেড়া নেই। সকলেরই জন্য মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত। সকলেরই সমান অধিকার ভিতরে প্রবেশের, বিগ্রহ স্পর্শের ও স্বহস্তে পূজা করার।

কেদার-বদরী যাত্রীপথে বহুস্থানে পাহাড়ের ধ্বস নেমে পথ বিনষ্ট হওয়ায়,

নূতন প্রশস্ত পথ নির্মাণের তাগিদে এ বৎসর ভারত সরকার ও উত্তর প্রদেশ সরকার কেদার-বদরী তীর্থযাত্রায় বিরত থাকতে অনুরোধ করে সংবাদপত্রে একাধিক ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিলেন। ফলে একবার যাত্রী সমাগম খুব কম হয়েছিল। আমরা সাহস করে আসায় দর্শনের সুযোগ ও সুবিধা পেলাম প্রচুর। বহুক্ষণ ধরে মন্দির অভ্যন্তরে বসে দেব-দর্শন ও পূজা-অর্চনা হ'ল নির্বিঘ্নে, বিনা বাধায়। শরীর ও মন সকলেরই হ'ল পরিতৃপ্ত, অন্তর হ'ল প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ। যিনি যতক্ষণ ইচ্ছা বিভিন্ন অর্ঘ্যে পূজা করলেন; কেদার-নাথের প্রস্তরময় দেহে কত যত্নে ঘৃতমর্দন করলেন। ভীমের গদাঘাতে মহিষরূপী মহাদেবের পলায়মান দেহে যে ক্ষত হয়েছিল, সে ক্ষত যে আজিও বিদ্যমান। অহঙ্কার-পরায়ণ গর্বিত মানুষের ঔদ্ধত্যের গদাঘাত দেবাদিদেবের বিশ্বব্যাপী দেহে আজও তো পতিত হচ্ছে অহরহ। সর্বত্র, সকল জীবে যখন তাঁর অবস্থিতি, তখন মানুষের বিদ্বেষ, মানুষের ঈর্ষা ও হিংসা যে মুহূর্তে অপরকে আঘাত করে সেই মুহূর্তে সে আঘাত পতিত হয় দেব-দেহে। আহত স্থানে বেদনা উপশমের জন্য ঘৃত মর্দনের প্রথা প্রচলিত আছে। সকল তীর্থযাত্রীই কেদারনাথের প্রস্তরময় গাত্রে সাধ্যমত ঘৃত লেপন করেন। মর্দন-নিরত হস্তের ভিতর দিয়ে ঘৃতের কোমলতা যদি মানুষের মনে সঞ্চারিত না হয়, মানুষের মনে যদি সর্বজনীন প্রীতি ও কারুণ্যের সৃষ্টি করতে সক্ষম না হয়, তা হলে ঐ দেব-দেহে ঘৃতমর্দন হবে নিরর্থক, ব্যর্থ-শ্রম। বেদনা তো কেদারনাথের প্রস্তরময় দেহে নেই, বেদনা যে মানুষের নিজ নিজ অন্তরে। ইচ্ছাকৃত অন্যায়, উদ্ধত অবিচার, যুক্তিহীন অবহেলা প্রভৃতির ফলে উদ্ভূত হয় ঐ বেদনা। পুঞ্জীভূত বেদনার প্রতীক কেদারনাথের প্রস্তরময় বিগ্রহ। বিশ্বাস ও ভক্তির অঞ্জনে যাঁদের মনশ্চক্ষু হয় উন্মীলিত, তাঁরাই ঐ প্রস্তরখণ্ডে দেখ্‌তে পান সর্ব দুঃখ-নাশন, সর্ববিপদ-বারণ শশাঙ্ক-মৌলী দেবাদিদেবের সুপ্রসন্ন মূর্তি।

পূজা-অন্তে বাইরে এসে দেখি তুষারবিমণ্ডিত রজতশুভ্র কেদারনাথ পর্বতের শৃঙ্গ ধ্যানাসনে উপবিষ্ট বিরাট এক মহাদেবের মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে কয়েকটি কুণ্ড আছে। যথা—রেত কুণ্ড, শিব কুণ্ড, ভৃগু কুণ্ড, উদক কুণ্ড। কেদারনাথের মন্দির নাকি পাণ্ডবদের দ্বারা নির্মিত। কেউ কেউ বলেন, আদি শঙ্করাচার্য এর সংস্কার সাধন করেন। এখন এই মন্দির পরিচালনার ভার ন্যস্ত আছে বদরীনাথ মন্দির পরিচালক সমিতির হাতে। কেদারনাথ ছাড়িয়ে আরও উপরে সেই মহাপ্রস্থানের পথ। যেখানে গেলে আর কেউ

ফিরে আসত না। সে পথে নাকি দুটি অলৌকিক নগ্নমূর্তি দেখতে পাওয়া যায়; তারা যাত্রীকে চিরশান্তিময় স্বর্গরাজ্যে নাকি নিয়ে যায়। কিন্তু আমরা যে প্রত্যাগমনকামী। আমাদের নির্বিঘ্নে নিয়ে যাওয়া ও কলকাতায় ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছিলেন, সেই কুণ্ডু স্পেশালের কর্মচারীবৃন্দ জানালেন যে ঐদিনই কেদার থেকে আমাদের ফিরতে হবে। আমাদের বিছানাপত্র যা তাঁরা বাহক মারফৎ (অবশ্য আমাদের খরচে) আনার ব্যবস্থা করেছিলেন তা সব রামাবারা থেকে কেদারে না আনিয়ে, গৌরীকুণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তাঁরা নির্দেশ দিয়ে এসেছেন। তার কারণ এঁদেরই অপর একদল যাত্রী দু'দিন আগে কেদারনাথ দর্শনে এসে অত্যধিক তুষারপাতের ফলে অসুস্থ হয়ে দারুণ বিপন্ন করেছিল এঁদের। কয়েকজন নাকি রাত্রে প্রচণ্ড শীতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। সঙ্গে বিচক্ষণ ডাক্তার থাকায় তাঁদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনা ও জীবিত ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। সে দলে একজন রাণী ছিলেন শুনলাম। তাই কিছু বিশেষ ব্যবস্থাও বুঝি হয়েছিল ডাক্তার ও ওষুধপত্রের। কুণ্ডু স্পেশালের প্রচার-পুস্তিকায় ডাক্তার ও প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সঙ্গে থাকার কথা উল্লেখ করা আছে এবং তা থাকেও বোধ হয়।

তবে প্রকারের তারতম্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমাদের দলের সঙ্গে কোনও ডাক্তার বা ওষুধপত্র ছিল না। যে একজন কলকাতার অফিসার আসছিলেন তাঁর পরিচয় ওরা দিচ্ছিল ডাক্তারবাবু বলে। তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন; ডিগ্রীও আছে জানা গেল। কিন্তু তিনিও প্রথম ধাক্কায় রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কলকাতায় ফিরে গিয়েছেন। কাজেই আমাদের দলে না ছিল কোনও রাজা বা রানী, না ছিল কোনও ডাক্তার। অথচ ক্ষীণদেহা বৃদ্ধা ছিলেন অনেকগুলি। অধিকাংশই সঙ্গীহীন। তাঁদের সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছেন কুণ্ডু স্পেশালের কর্তৃপক্ষ। কাজেই আমাদের ফিরতে হ'ল সেইদিনই। দলবদ্ধ হয়ে যাওয়ার এবং অপরের উপর নির্ভর করে যাওয়ার যেমন সুখ-সুবিধা আছে অনেক, তেমন দুঃখও আছে। নিজের ইচ্ছামত কোথাও থাকার বা কিছু করার উপায় থাকে না।

থাকা, খাওয়া ও যাওয়া-আসার সর্ববিষয়ে যাঁরা ব্যবস্থা করছেন, তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হ'ল। তা মেনে নিতে আমাদের কোনও আপত্তির কারণ অবশ্য ছিল না। দর্শন, পূজা সবই তো সুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে। মন পরিতৃপ্ত। আর কী চাই? দীর্ঘাচরিত প্রথা আছে তিন রাত্রি অথবা

অন্ততঃ এক রাত্রি তীর্থবাস করা। সে একটা সংস্কার। ভালই। সংস্কার মানতে পারলে ভাল। কিন্তু সকল অবস্থায় তা তো সম্ভব হয় না। সুতরাং সেইদিনই আমাদের ফিরতে হ'ল।

ফেরার পথে মন্দাকিনীর পশ্চিম পারে এসে যখন তুষারক্ষেত্রের উপর দিয়ে আসছিলাম তখন সামান্যক্ষণ গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারবর্ষণ হ'ল। আদৌ কষ্ট-দায়ক নয়; বরং আনন্দপ্রদ। ভারী ভাল লাগলো। মনে হয়েছিল যেন শ্রীশ্রীকেদারনাথের আশিষ-ধারা বর্ষিত হ'ল। যতক্ষণ আমরা কেদারনাথ-ধামে ছিলাম সর্বক্ষণ গুরুকৃপা তৃপ্তিপ্রদ রৌদ্রের আকারে আমাদের ঘিরে রেখেছিল; রক্ষা করছিল প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ থেকে। শুনলাম এ নাকি দুর্লভ সৌভাগ্যসূচক।

ফিরবার পথে 'রামাবারা'য় না থেমে আমরা সাত মাইল পথ নেমে এসে 'গৌরীকুণ্ডে' পৌছলাম বিকেলবেলায়। সেখানে ধর্মশালায় রাত্রিবাস করে পরদিন ১৮ই মে শনিবার সকালে সেখান থেকে রওনা হলাম। গভীর অরণ্য-পরিবৃত পথ অতিক্রম করে পেরিয়ে এলাম 'শোন-প্রয়াগ'।

বলা হয়নি, আমাদের ডাণ্ডীবাহকরা যেমন কর্তব্যপরায়ণ তেমনি ভদ্র ও মিষ্টভাষী। মাঝে মাঝে অবশ্য তারা ডাণ্ডী নামিয়ে একটু তফাতে গিয়ে গঞ্জিকা সেবন করছিল। নইলে পারবে কেন? শরীরের উত্তাপ সংরক্ষক ও সহন শক্তিবর্ধক এই দ্রব্যের প্রয়োজন অপরিহার্য।

ডাণ্ডীবাহকদের না ছিল শীতবোধ, না ছিল ক্লান্তিবোধ। এদের দলে একজন ছিল বেশ বর্ষীয়ান ব্যক্তি। নাম শোভন সিং। সে মাঝে মাঝে উচ্চৈস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করত—'টাইম্ প্লীজ'? শুনলাম তার ছেলেরা মোটর ড্রাইভার। বেশ ভাল মাহিনা পায়। তাকে নিষেধ করে ডাণ্ডীবাহকের কাজ করতে। কিন্তু তার নাকি এ কাজে ভারী আনন্দ, ছাড়তে পারে না। কত নূতন নূতন যাত্রীকে দেব-দর্শনে নিয়ে যায় দুর্গম পথে। পরে এক জায়গায় এক হাঁটু সমান প্রবল জলস্রোতের ভিতর দিয়ে খানিক পথ আমাদের যখন যেতে হয়েছিল পাহাড়ী পথে, শোভন সিং আমাকে তার পিঠে নিয়ে পার করে দিয়েছিল, জুতা মোজা আমাকে খুলতে দেয়নি।

এ রামায়ণ মহাভারতের অনেক কাহিনী জানে দেখেছি। এমন কি ভাগবতেরও। কোনও কোনও চটিতে আমাদের কাছে বসে সেই সব গল্প

বলত। অবশ্য হিন্দীতে। আমার সহধর্মিণীর বাল্যজীবন কেটেছে লক্ষ্ণৌ-এ ও পাটনায়। হিন্দী ও উর্দুতে যথেষ্ট দখল আছে তাঁর। তিনি ওদের কথা ও গল্প স্বচ্ছন্দে শুনতেন, বুঝতেন এবং তাদের আলোচনায় যোগ দিতেন। তাতে তারা ভারী খুশী হ'ত। আমি বুঝতে পারতাম, তবে বেশী কথা বলতাম না। ভাষাজ্ঞানে পারদর্শিতার অভাবে। অন্য কোনও কারণে নয়। ওদের সেবার ঋণ অপরিশোধ্য। কোনও মূল্যই যথেষ্ট মনে হ'ত না। ঐ পথে আমার পক্ষে যাওয়া ছিল একেবারে অসম্ভব। কয়েক বছর আগে যাকে বলে 'মাইল্ড্ স্ট্রোক' হয়েছিল। ডাক্তারের নিষেধ উপরে ওঠা, কষ্টসাধ্য পরিশ্রমের কাজ করা। তাতে নাকি সহসা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হবার আশঙ্কা। তা বন্ধ তো একদিন হবেই। কোর্টে কাজ করতে করতে কারো হয়, বিছানায় আরামে শুয়ে থেকেও হয়। আমার না হয় এই তীর্থযাত্রার পথে দেবতাত্মা হিমালয়ের কোলেই হ'ত। তার জন্য কিছু নয়। তবে শারীরিক শক্তি ছিল না পর্বতারোহণের। তাই এই ডাণ্ডীবাহকদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। তাদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। তবে এও মনে হয়, যে প্রবল ইচ্ছা থাকলে ও পরমানন্দ মাধবের কৃপালাভ হ'লে অসম্ভবও সম্ভব হয়, পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘনের শক্তি পায়। চোখেই দেখতে পেয়েছি, এক শীর্ণকায় ন্যুব্জ-দেহ বৃদ্ধ পরিহিত বস্ত্রের এক অংশে উর্ধ্বাঙ্গ আবৃত করে ছোট একটি লাঠিতে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছে ওই দুর্গম পথে কেদারনাথ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায়। চলেছে তীর্থ দর্শনে। সম্বল? বাইরে তো কিছুই দেখা গেল না। মনে নিশ্চয় আছে, মনের জোরে অর্জন করেছে তাঁর কৃপা, যাঁর কৃপায় মূক হয় বাচাল, পঙ্গুও সক্ষম হয় গিরিলঙ্ঘন করতে। তিনিই এর সহায় ও সম্বল—সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বল।

আমরা 'শোন-প্রয়াগ' ছাড়িয়ে ক্রমশঃ এলাম রামপুরে। সেখানে ধর্ম-শালায় স্নানাহার সেরে অপরাহ্ণে এলাম পূর্ববর্ণিত 'ফাটা' নামক স্থানে। মাত্র তিন মাইল দূরে। তখন গরম বোধ হচ্ছিল, রাত্রে কিন্তু পাহাড়ের উপর বেশ ঠাণ্ডা ছিল। ধর্মশালার ঘরে জানালা-দরজা বন্ধ করে কম্বল গায়ে দিয়ে আরামে নিদ্রাগত হলাম।

পরদিন ১৯শে মে সকালে 'ফাটা' থেকে চা ও জলযোগের পর রওনা হয়ে সাড়ে নটায় পরবর্তী বিশ্রামস্থল 'নারায়ণ কোঠি'তে এসে পৌছলাম। পথে দেবী মহিষমর্দিনী দর্শন করা হল, যাওয়ার সময় দেখা হয়নি বৃষ্টির ভয়ে।

তারপর 'জুড়ানী' নামক একস্থানে মনোরম ফুল ও ফলের বাগান দেখতে পাওয়া গেল। সরকারী নয়; একজন নেপালী ব্যবসায়ীর। গাছে গাছে সুপক্ক, সুপুষ্ট কমলালেবু মুসুম্বি প্রভৃতি উপাদেয় ফল ঐস্থানের শোভা-বর্ধন এবং জুড়ানী নামের সার্থকতা সম্পাদন করে বিদ্যমান। ফুলের তো কথাই নেই। বর্ণ বৈচিত্র্যে মনোমুগ্ধকর। পথের ধারে এক কাষ্ঠফলকে লেখা আছে দেখলাম 'অরেঞ্জ স্কোয়াশ'। সামনে একটি ছোট ঘরে চেয়ার, বেঞ্চ, কাচের আলমারি রয়েছে। আলমারির ভিতরে বোতল ভর্তি ফলের রস। বসলাম সেই ঘরে। আমাদের সামনে গাছ থেকে পাড়া টাটকা কমলালেবুর রস বোতলে ভর্তি করে কাগজের নলসহ আমাদের খেতে দিল। দাম প্রতি বোতল ৩৫ (নয়া) পয়সা। রসনা-তৃপ্তিকর ও পিপাসা-নাশক সেই রস সকলে পান করলাম। ডাণ্ডীবাহকদের জন্য তাদের পছন্দ অনুযায়ী কমলালেবু কিনে দিলাম। তারপর যথাসময়ে ডাণ্ডীবাহিত হয়ে নারায়ণ কোঠিতে এসে পৌঁছলাম। এইখানে পেলাম যাকে বলে মাছির উৎপাত। ভীষণ উৎপাত। আর কোথাও পাইনি। কেদার-বদরী তীর্থযাত্রার যতগুলি কাহিনী পড়েছি তার সবগুলিতেই ঝড় জল ও মাছির উৎপাতে কষ্ট পাওয়ার কথা উল্লেখ আছে দেখেছি। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দলের কাউকে কোনও দিন জল-ঝড়ে কষ্ট পেতে হয়নি। বৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু পথে থাকতে নয়, আশ্রয় পাওয়ার পর। মাছি অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থানে আছে দেখেছি; তবে উৎপাত দেখলাম এই একমাত্র নারায়ণ কোঠিতে এসে। এ স্থান শ্রীশ্রীকেদার থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে। কিন্তু মনে হ'ল যেন কতদূরে চলে এসেছি। কোথা থেকে কোথায় এলাম? কোথায় ফিরে চলেছি? তবে এখনও মনে এই আশা ও উৎসাহ রয়েছে যে এই পথে নেমে গিয়ে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে অলকানন্দার তীর ধরে আমরা শ্রীশ্রীবদরী-নারায়ণের পথে যাব। এখনই ফিরে যেতে হবে না ধূলির ধরণীর কর্দমাক্ত মালিন্যের মধ্যে। নারায়ণ কোঠিতে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির সারিবদ্ধ-ভাবে দণ্ডায়মান। স্নানাহারের পর ক্রমশঃ আমরা নালা চটি ও গুপ্তকাশী ছাড়িয়ে অপরাহ্ণ সাড়ে চারটায় ফিরে এলাম 'কুণ্ড' চটিতে। এখানে বেশ গরম বোধ হয়েছিল। ডাণ্ডীবাহক ও ভারবাহীর দল এখান থেকে এখন বিদায় নিল। তারা হাঁটাপথে চলে যাবে 'যোশীমঠে'। সেখানে গিয়ে আমরা আবার তাদের পাব। সেখান থেকে ১৯ মাইল হাঁটাপথে যেতে হয় শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ ধামে। এখন 'কুণ্ড' চটি থেকে মন্দাকিনীর সেতু পেরিয়ে

আমাদিগকে যেতে হবে ওপারে ; সে স্থানের নাম কাকরাগার্ড। সেখান থেকে মোটর-বাসে রুদ্রপ্রয়াগ। তারপর রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দার সেতু পার হয়ে অপর পার থেকে অন্য 'বাসে' যেতে হবে 'যোশীমঠ' পর্যন্ত। শোনা গেল কাকরাগার্ড থেকে রুদ্রপ্রয়াগ ফিরে যাবার পথে একস্থানে পাহাড়ের ধ্বস্ নেমেছে ; পথ হয়েছে অবরুদ্ধ। কাজেই মোটরবাস বরাবর একটানা যেতে পারবে না রুদ্রপ্রয়াগ টানেল পর্যন্ত। অবরুদ্ধ পথটুকু হেঁটে পার হয়ে সেদিকে অপর একখানি 'বাসে' উঠতে হবে। আমাদের ম্যানেজার শ্রীমান্ বাদলচন্দ্র বললেন যে তিনি 'তার' যোগে ব্যবস্থা করেছেন যাতে আমাদের অর্থাৎ কুণ্ডু স্পেশালের যাত্রীদের জন্য দুখানি করে 'বাস্' এদিকে এবং ওদিকে দুই দিকেই থাকে। 'বাসে'র কর্তৃপক্ষ নাকি ঐ ব্যবস্থা করবেন বলে কথা দিয়েছেন।

পরদিন ২০শে মে সোমবার স্নানাহারের পর 'কুণ্ড' চটি থেকে বেরিয়ে মধ্যাহ্ন সাড়ে বারোটায় বেশ খানিক পথ ও মন্দাকিনীর সেতু পদব্রজে অতিক্রম করে বাস্-স্ট্যাণ্ড-এর কাছে এসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। 'বাস্' তখনও আসেনি। রাস্তার ধারে ছোট ছোট দুখানি দোকানঘর। প্রখর রৌদ্রের উত্তাপ থেকে নিস্তার পাবার আশায় সেই দোকানের ধূলি-ধূসরিত চাটাই-এর উপর আমরা বসে সঙ্গে থাকা বাস্কেট থেকে ভাঁজকরা হাতপাখা খুলে নিয়ে বাতাস খেতে লাগলাম। একটি ছোট বেতের বাস্কেট আমার সঙ্গে থাকে। তাতে পলিথিনের জলের ফ্লাস্ক, গেলাস, প্লেট, চামচে, আয়না, চিরুণি, সাবান, তেল, সেভিং সেট, তোয়ালে থেকে আরম্ভ করে ডেটল, ভিক্স্ ভেপোরাব, অমৃতাঞ্জন, কিছু হোমিওপ্যাথি ঔষধ, তালমিছরী, বিস্কুট, ইসবগুল, মায় টর্চ ও ভাঁজকরা হাতপাখা প্রভৃতি থাকে। প্লাস্টিকের ওয়াটারপ্রুফ কোট ও টুপীও ভাঁজ-করা থাকে তারই ভিতরে। কাজে লাগে দরকারের সময়। বাইরে বেরিয়ে ছোটখাটো দরকারী জিনিস সবরকম সঙ্গে রাখার অভ্যাস দেখেছিলাম স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের। কলকাতার ক্যাণ্টোফার লেনে প্রাসাদতুল্য বাড়িতে তিনি বাস করতেন। নামকরা পরিবার। নিজে ছিলেন আইনজীবী ; একবার কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হয়েছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল নিজের সমস্ত কাজ নিজের হাতে করা ; বাইরে কোথাও গেলে দরকারী জিনিস সব থাকত তাঁর সঙ্গে ; মায় মশারী টাঙাবার জন্য দড়ি, পেরেক ও ছোট একটি লোহার হাতুড়ি। স্বল্পভাষী,

বিচক্ষণ নিয়মনিষ্ঠ লোক ছিলেন তিনি।

যাক্, বসে আছি আমরা; মোটরবাস আর আসেই না। কলকাতার জুয়েলার মশাই রাস্তার অপর পার্শ্বে পর্বতগাত্রে হেলান দিয়ে 'হোল্ড-অল' প্রভৃতির উপর উপবিষ্ট ছিলেন স-পরিবার ও স-'আয়ার'। বরাবর তিনি স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতেন। পরে শুনেছিলাম এ তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও হয়ত এর প্রয়োজনও ছিল তাঁর।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দুখানি 'বাস্' যাত্রীসহ এসে পৌঁছুল অপরাহ্ণ তিনটায়। যাত্রী সব নেমে গেল। সেই খালি হওয়া 'বাসে' আমরা উঠে বসলাম। মাল-পত্র তোলা ও নামানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন 'কুণ্ড স্পেশালে'র লোকেরা।

আমরা নিশ্চিন্ত মনে যে যেখানে পারলাম দুখানি 'বাসে' উঠে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে 'বাস্' দুখানি চলতে শুরু করলো। বিকেল পাচটায় এসে দাঁড়ালো অবরুদ্ধ পথের সামনে। সকলে নামলাম। পুলিস পাহারায় পথরক্ষক দল অবরোধ অপসারণের কাজে দেখলাম নিযুক্ত। তিন-চার ফার্লং পথ হেঁটে এদিকে এসে দেখা গেল মাত্র একখানি 'বাস' রয়েছে, তারও অর্ধেক অপর-যাত্রীতে ভর্তি। আমাদের দলের সকলের স্থান হওয়া অসম্ভব। কয়েকজন তাতেই উঠে পড়লেন। পূর্ববর্ণিত 'প্রিন্স্ ভ্যাগাবণ্ড' ও তাঁর পথে পাওয়া পাতানো মা-ও ঐ 'বাসে'ই এগিয়ে গেলেন। ম্যানেজার বাদলচন্দ্র গেলেন যদি কোনও উপায়ে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে আমাদের জন্য দুখানি 'বাস' আনতে পারেন তারই চেষ্টায়। রুদ্রপ্রয়াগ সেখান থেকে আট মাইল। আমাদের কাছে রইলেন শ্রীমান বিশ্বরূপ। ছেলেটির স্থির বুদ্ধি, সাহস, সৌজন্য ও কর্তব্যপরায়ণতা খুবই প্রশংসনীয়। নির্জন নিরালাপথে পরিত্যক্ত আমরা যে সেদিন রাত্রি-যাপনের নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছিলাম তা কেবল তারই চেষ্টায়। 'বাস্' চলে গেল। আমরা প্রচুর মালপত্রসহ সেইখানে পথে বসলাম। হ্যাঁ, পথে বসা যাকে বলে একেবারে তাই। সেই স্থানের কাছে কোনও লোকালয় নেই। একপাশে উঁচু পাহাড় অপর পার্শ্বে বহু নিম্নে খরস্রোতা মন্দাকিনী। উন্মুক্ত উদার আকাশের নীচে, পার্বত্য প্রকৃতির নিজস্ব ক্রোড়ে। ভারী ভাল লাগছিল সেই পরিস্থিতি। নিকটতম চটি 'তিল-ওয়াড়া' আড়াই-তিন মাইল দূরে। আরও কিছু পথ গেলে বনের ভিতর পাহাড়ের গায়ে আছে 'ছাতৌলি' চটি।

এখানে সাতজন পরিচারকসহ আমরা প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ জন যাত্রী উপস্থিত এই নির্জন স্থানে পথের ধারে বসে রইলাম। কেউ দাঁড়িয়ে রইলেন, কেউ ইতস্তত

ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আমরা বসে দাঁড়িয়ে থাকলেও সময় তো বসে দাঁড়িয়ে থাকবে না। দিনের আলো ক্রমশঃ ক্লান্তপদে রাতের শান্তিপ্রদ অন্ধকারে আত্মসমর্পণ করতে এগিয়ে চলেছে। পাহাড়ের গায়ে, নদীর জলে বেলা-শেষের সোনালী আলোর খেলা দেখতে বেশ ভালই লাগছিল। কিন্তু ঐ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত স্থানে রাত্রি যাপনের সম্ভাবনা প্রীতিপদ না হয়ে অনেকেরই মনে ভীতিপ্রদ হয়েছিল। হওয়াই স্বাভাবিক। পর্বতগাত্রে কয়েকটি বড় বড় গর্তের মুখ দেখতে পাওয়া গেল। তার ভিতরে কারা আত্মগোপন করে দিনাতিপাত করে এবং রাতের অন্ধকারে আহার অন্বেষণে নির্গত হয় তা সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব হ'ল না। অনুমানে তাদের আকৃতি-প্রকৃতি বা খাদ্যবিষয়ে রুচি সব কিছু একটা অবশ্যম্ভাবী বিপদেরই ইঙ্গিত ব্যক্ত করলো। একটা কথা। কলকাতার জুয়েলার মশাইকে এখানে পথপার্শ্বে ধূলিশয্যায় শয়ান দেখে দুঃখ অনুভব করেছিলাম। অদৃষ্টের এ কী নির্মম পরিহাস। যিনি সর্বত্র শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যলাভের জন্য অতিমাত্রায় প্রয়াসী তাঁকে শেষে পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়তে হ'ল। এদিকে দেখি দ্রুতপদে সন্ধ্যা আসে নেমে। কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী। এখনি নিবিড় অন্ধকারে দৃষ্টিশক্তি হবে বিলুপ্ত। বাদলচন্দ্র ও তাঁর প্রত্যাশিত 'বাসে'র প্রতীক্ষা পরিত্যাগ করে আমরা রাত্রিবাসের আশ্রয়-অন্বেষণে হাঁটতে শুরু করলাম। ইতিমধ্যে শ্রীমান বিশ্বরূপ এগিয়ে চলে গিয়েছিলেন মালপত্র বহনের জন্য অশ্ব-সংগ্রহের মানসে। মালপত্র বড় কম ছিল না। এতগুলি তীর্থযাত্রীর তো ছিলই, তার উপর যাত্রীদের পথে খাদ্য সরবরাহ করার জন্য তৈজসপত্র খাদ্যের উপাদান প্রভৃতি 'কুণ্ডু স্পেশালে'র দ্রব্যসম্ভারও ছিল প্রচুর।

আমরা আর অপেক্ষা না করে হেঁটে এগিয়ে গেলাম সেই পার্বত্যপথে। তিলওয়াড়া চটিতে পৌছবার আগেই দৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লো অন্ধকারের আবরণে। তিলওয়াড়া দেখলাম হোটেলে বাজার জমজমাট; কিন্তু কোনও গৃহে আর তিল ধারণের স্থান ছিল না। সুতরাং ক্লান্তপদে আরও এগিয়ে যেতে হ'ল ছাতোলি চটিতে। চারিদিকে তখন নিবিড় অন্ধকার। পথের ধারে রাস্তা থেকে কিছু উপরে পাহাড়ের গায়ে লম্বা লম্বা দুখানি মাটির ঘর। ঘর মানে তিন দিকে মাটির দেওয়াল। সামনের দিক সম্পূর্ণ খোলা। পাশাপাশি দুটি পাহাড়ের উপর। একটি কাঠের সেতু দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত। নীচে দিয়ে বোধহয় জলপ্রবাহ যায়। চারিদিকে গভীর অরণ্য। আমাদের সহ-যাত্রীদল একে একে এসে পৌছলেন। প্রথম পাহাড়ের উপর যে ঘরখানি

তাতে একটা আলো জ্বলতে দেখে যে যেমন করে পারলেন তাতে উঠে গেলেন। অবশ্য যার যেটুকু শক্তি ছিল তা ব্যয় করছিলেন কুণ্ডু স্পেশালকে গালাগালি দিতে। কুণ্ডু স্পেশালের যে কী অপরাধ তা বুঝতে পারলাম না। শুধু বুঝলাম মানুষ কত অল্পে আত্মহারা হয়ে পড়ে। কত সামান্য অসুবিধায় আগেকারের সকল সেবা-যত্ন বিস্মৃত হয়ে কটুবাক্যের স্রোত বইয়ে দেয়। ঐ সব কথাবার্তায় জানতে পারা গেল কার কয়খানি মোটরগাড়ি আছে কলকাতার বাড়িতে। কার বাড়ির মেয়েরা মোটর চড়ে গঙ্গাস্নান করতে যান, কখনও এক পা রাস্তায় হাঁটতে হয় না। ইত্যাদি। আমরা একটু থেমে একটু পরে অপর পাহাড়ে থাকা ঘরটি আবিষ্কার করলাম এবং তাতে বেশ আরামে বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। ইতিমধ্যে বিশ্বরূপ ঘোড়ার পিঠে বোঝাই দিয়ে সমস্ত মালপত্র অন্ধকারের ব্যূহ ভেদ করে এনে পৌঁছেছিলেন। তাঁর কর্মতৎপরতা পূর্বেই বলেছি প্রশংসনীয়। আমার সঙ্গে থাকা বেতের বাস্কেট থেকে বাতি-দেশালাই বার করে আলো জ্বেলে নিলাম। রাত তখন নয়টা বেজে গিয়েছিল। জিনিসপত্রের সন্ধান নিতে গিয়ে দেখি সব এসেছে, আসেনি কেবল আমার একটি নূতন 'হোল্ড অলে' বাঁধা বিছানা। তার ভিতর শুধু বিছানা নয়, ছিল কয়েকখানি দামী কম্বল, আমার একটা মোটা গরম প্যাণ্ট, গরম কাপড়ের লংকোট। কী আর তখন করা যাবে? অন্য যা বিছানা ছিল তাই পেতে নিয়ে সবাই শুয়ে পড়লাম বিশ্রাম করতে।

বিশ্রাম ছিল না পাচক ও পরিচারকদের। কী অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিল তারা। ঐরকম অত্যন্ত অসুবিধাজনক স্থানেও আগুন জ্বেলে, জলসংগ্রহ করে, অতগুলি যাত্রীর জন্য রাত্রের আহার রন্ধন করে রাত্রি সাড়ে এগারটায় সকলকে পরিবেশন করে খাইয়ে দিয়েছিল। অপ্রত্যাশিত সেই খাদ্য গ্রহণের সময় মনে হয়েছিল, 'একেই কি বলে অমৃত'? ঐরকম স্থানে ঐরকম অবস্থায় না পড়লে খাদ্যের ঐ অমৃত আস্বাদন উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কী তৃপ্তিতে যে আমরা সেদিন রাত্রে আহার করেছিলাম, কী আরামে 'জয় বদরীবিশাল' নাম স্মরণ করে প্রগাঢ় সুষুপ্তিতে নিমগ্ন হয়েছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আহারে ও নিদ্রায় সে প্রকারের পরিতৃপ্তি দুর্লভ। তাই একাধিক কারণে সেদিন-কার ছাতৌলি চটিতে রাত্রিযাপন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তীর্থযাত্রার পথ নিরবচ্ছিন্নভাবে সুগম ও মসৃণ হওয়া অবশ্যই আশা করা চলে না। তবে, কেদারনাথ মহাদেব, আশুতোষ; অল্পেই সন্তুষ্ট। তাঁর অপর নাম কৃতার্থ-

নাথ। কষ্ট তিনি কাউকে বিন্দুমাত্র দেননি। সারা পথে কোথাও কোনও বিশেষ বাধাবিঘ্ন আসেনি। দুর্গম পথও সুগম হয়েছিল। কিন্তু বদরীনারায়ণ! নারায়ণ যে চক্রধারী, সকলের সকল দর্পনাশকারী। মনের গোপনতম অহঙ্কারও নারায়ণ চূর্ণ করে আসছেন, যুগে যুগে। সখা অর্জুন, একান্ত অনুগতা দ্রৌপদী কেউই রেহাই পায়নি। ভক্তকে কঠিন পরীক্ষা করে, যাচিয়ে দেখে, তবে কাছে আসতে দেন। সহজলভ্য নয় তাঁর দর্শন।

পরদিন ২১শে মে মঙ্গলবার খুব ভোরে যথারীতি গরম চা ও জলখাবার খাওয়া হচ্ছে, এমন সময় ম্যানেজার বাদলচন্দ্র দুখানি 'বাস্' নিয়ে উপস্থিত হলেন। শোনা গেল এখানকার পার্বত্যপথে অপরাহ্ণ পাঁচটার পরে রুদ্রপ্রয়াগ টানেল 'বাস-স্ট্যাণ্ড' থেকে কোনও 'বাস্' ছাড়ার অনুমতি কেউ পায় না। কাজেই আগের দিন সাড়ে পাঁচটায় রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছে বাদলচন্দ্র কিছুতেই দুখানি 'বাস্' সেখান থেকে ছাড় করিয়ে আনতে পারেননি। অনুরোধ, প্রলোভন কিছুতেই কর্তব্যনিষ্ঠ পুলিস কর্তব্যচ্যুত হয়নি। 'বাস্' আনার অনুমতি তখন দেয়নি। বলবার কিছু নেই। যাক, যাঁর ইচ্ছা না হ'লে গাছের পাতাটিও মাটিতে পড়তে পারে না, তাঁরই বিধানে গতরাত্রে আমাদের ভাগ্যে নির্জন ছাতৌলি চটিতে অবস্থানের দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়েছিল। যাক্, আজ সকাল সাড়ে সাতটায় মালপত্র 'বাসে'র মাথায় বোঝাই দিয়ে আমরা ছাতৌলি চটি পরিত্যাগ করলাম। সকাল আটটায় এসে পৌঁছলাম রুদ্রপ্রয়াগ টানেল। নেমে নির্ধারিত ধর্মশালায় উঠলাম। আগের দিন আমাদের দলের যে কজন সাধারণ যাত্রী-বাহী 'বাসে' এখানে এসেছিলেন, তাঁদের কাছে খোঁজ নিলাম, কিন্তু আমার হারানো বিছানার কোনও কিনারা হ'ল না। যাবার হ'লে গিয়েছে, পাবার হ'লে পাব, এই ভেবে চুপ করে রইলাম। না, ঠিক বলা হ'ল না। প্রয়োজনের তাগিদ অথবা আসক্তি চুপ করে থাকতে দিল না। জানি, মানসিক শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য লাভ এবং ক্ষতি সমান নিরাসক্তির সঙ্গে গ্রহণ করা দরকার। কিন্তু সে মনোভাব আয়ত্তে আনা গৃহীর পক্ষে কি সম্ভব হয়? সামান্য ক্ষতিতেও মন চঞ্চল হয়। মনে হয়, 'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।' আসল সম্পদ্ আমাদের কতটুকু? আর সত্যিকারের প্রয়োজনও কত অল্প! কিন্তু কী সীমাহীনভাবে সেই প্রয়োজনকে বাড়িয়ে কী দুর্বহ বোঝা আমাদের বইতে হয়। রূপক নয়, কঠিন বাস্তব। হাঁটাপথে মাল বইবার জন্য আমাদের দিতে হয়েছিল সের

প্রতি দু টাকা চার আনা হিসাবে। আমাদের মালের ওজন হয়েছিল প্রায় তিন মণ। যাক্, রুদ্রপ্রয়াগ টানেলের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, আর এই সব ভাবছি এমন সময়ে দেখলাম কুণ্ড-চটি বা কাকরাগার্ড থেকে একখানি 'বাস্' সরাসরি যাত্রী নিয়ে এসে পৌঁছল। রাস্তা ইতিমধ্যে মেরামত বা পরিষ্কার করা হয়ে গিয়েছে। ঐ 'বাসে'র ড্রাইভারের মুখ দেখে চিনতে পারলাম, গতকাল এরই পাশে বসে ঐ 'বাসে' আমি এসেছিলাম। তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমার হারিয়ে যাওয়া বিছানার কথা। তৎক্ষণাৎ সে সানন্দে দেখিয়ে দিল 'বাসে'র ভিতরে পড়ে আছে আমার খয়েরী রং-এর নূতন ওয়াটারপ্রুফ 'হোল্ড-অল'। এটি গতকাল মোটে নামিয়ে নেওয়াই হয়নি। গাড়িতেই থেকে গিয়েছিল। যাক্, হারানো জিনিস ফিরে পেলাম। সব হারানো জিনিস কি এমন ক'রে পাওয়া যায়? যায় না। 'আমার, আমার' ব'লে বেশী ক'রে আঁকড়ে ধরতে চাইলে, বুঝি তা একেবারে হারিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের এক মর্মস্পর্শী সঙ্গীতে আছে—"যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে, সব যদি দেই সঁপিয়া তোমাকে, তবে নাহি ভয়, সবই জেগে রয়, তব মহা মহিমায়।' সব সমর্পণ করতে হয় তাঁকে। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"।

হারানো বিছানা ফিরে পেয়ে খুশী হলাম বৈকি। ড্রাইভার কণ্ডাকটারের সততা প্রশংসনীয়। সাধারণ যাত্রীদেরও। যে কেউ অনায়াসে নামিয়ে নিতে পারতো ঐ বিছানা। ড্রাইভারের নাম মঙ্গল সিং। তাকে কিছু বকশিশ দিতে গেলাম; নিলো না। একটু হেসে হাতজোড় করে বলল, আপনার জিনিস আপনি ফিরে পেলেন, আপনি খুশী হলেন,—এ-ই আমার বকশিশ। আরও বলল,—এখানে সচরাচর কারো কিছু হারায় না; কেউ কারো জিনিস নেয় না। সত্যিই তাই। পাহাড়ী লোকেরা যেন জন্মগত সারল্য ও সততার হীরক-কঠিন উপাদানে গঠিত। প্রীতিভাজন বন্ধু খ্যাতনামা চলচ্চিত্র অভিনেতা রাধামোহন ভট্টাচার্যের কাছে পরে শুনেছি যে কয়েক বছর আগে যখন তিনি কেদার-বদরী তীর্থ দর্শনে গিয়েছিলেন তখন যে পাহাড়ী কুলী পার্বত্যপথে তাঁদের মোট বহন করে তাঁদের সঙ্গে যাচ্ছিল, তাকে পথে পড়ে থাকা কিছু পয়সা নাকি কে কুড়িয়ে নিতে বলেছিল; কুড়িয়ে নিয়েছিল সে, কিন্তু পরদিন তার জ্বর হয়েছিল; সেই পয়সাগুলি মন্দাকিনীর জলে নিক্ষেপ করে তবে সে সুস্থ হয়। এরা যেন স্বভাবতঃ জানে উপনিষদের নিষেধবাণী—"মা গৃধ কস্য-সিদ্ধনং", অপরের অর্থে লোভ করিও না। এ বুঝি তাদের জন্মগত সংস্কার।

শ্রীশ্রীবদরীনাথ তীর্থযাত্রা

রুদ্রপ্রয়াগে ২১শে মে সমস্ত দিনরাত আমাদের থাকতে হ'ল। আমরা সবাই থাকলাম বাবা কালীকমলিওয়ালার মাটির ধর্মশালায়। কলকাতার জুয়েলার মশাইরা স-'আয়ার' রুদ্রেশ্বর মহাদেব-মন্দির সংলগ্ন অতিথি-নিবাসে ঘরভাড়া করে রইলেন। কুণ্ডু স্পেশালের লোকেরা যথাসময়ে তাঁদের পাঁচজনের চা, জলখাবার এবং দিনে রাত্তে ভাত, লুচি তরকারী সব পৌঁছে দিয়ে আসছিল, অবশ্য বিরক্তি সহকারে। ঠিক কর্তব্যবোধে না গালাগালির ভয়ে তা বলা শক্ত। আমরা সন্ধ্যায় প্রায় শতাধিক সোপান অবতরণ করে মন্দাকিনী-অলকানন্দার সঙ্গম স্থলে এক মাতাজী প্রতিষ্ঠিত চামুণ্ডা-মন্দিরের চত্বরে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলাম; শুনলাম সমুদ্রগর্জন-তুল্য জল-কল্লোল। রাত্রে আহারাদির পর দেখি আমাদের সুবৃহৎ শয়ন-কক্ষ যাত্রীসমাগমে পরিপূর্ণ। তিলার্ধ স্থান নেই কোথাও। আমাদের শয্যার ঠিক পাশেই যাতায়াতের পথে এক বৃদ্ধের সঙ্গে ছয় সাতজন বিভিন্ন বয়সের স্ত্রীলোক এসে বড় বড় পৌটলা নামিয়ে খালি মাটির উপর কেউ বসে কেউ শুয়ে একটু বিশ্রাম করে নিলেন। তাঁদের কথাবার্তায় মনে হ'ল অন্ধ্রদেশবাসী বলে। কিছুক্ষণ পরে রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটায় প্রত্যেকের গাঁটরি থেকে মেপে মেপে চাল বার করে নিয়ে দুই তিনজন স্ত্রীলোক নীচে নেমে গেলেন ভাত রান্না করতে। চলেছেন তাঁরাও বদরীবিশাল দর্শন করতে। রাত্রি প্রায় একটায় তাঁদের রান্না ও খাওয়া শেষ হ'ল। তারপর অল্পক্ষণ ভূমিশয্যায় শয়নের পর রাত্রি চারটায় দেখি তাঁরা উঠে বসে যে যার পোঁটলা নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ঐ পৌটলাতেই তাঁদের যা কিছু দরকারী সব আছে। নিজেরাই বয়ে নিয়ে চলেছেন। তাঁদের একটু পরে আমরাও বার হলাম। কিন্তু পার্থক্য অনেক-খানি। যথারীতি প্রাতঃকৃত্য সমাপন ও সদ্য প্রস্তুত গরম সিঙ্গাড়া সহযোগে গরম চা সেবনের পর বেশ আরামে পদব্রজে ধীরে সুস্থে অলকনন্দার সেতু পার হয়ে ওপারে গিয়ে আমাদের জন্য পূর্ব থেকে সংরক্ষিত 'মোটর বাসে' বসলাম। মালপত্র বয়ে আনলো কুলীরা, কুণ্ডু স্পেশালের লোকেদের তত্ত্বাবধানে। এখন যাবো আমরা যোশীমঠে। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে সাড়ে আটষট্টি মাইল। বর্তমান সময়ে যোশীমঠ পর্যন্ত 'বাস' চলাচল করছে। সেখান থেকে বদরীনাথধাম হাঁটাপথে উনিশ মাইল।

২২শে মে বুধবার প্রত্যুষে আমাদের 'বাস' যাত্রা শুরু হ'ল বদরীনাথের পথে। অলকানন্দার তীর ধরে চলেছি। পথ বেশ প্রশস্ত ও সুরক্ষিত। প্রাইভেট 'মোটরকার' দেখলাম কয়েকখানি এগিয়ে চলে গেল। পনের মাইল এসে পেলাম 'গৌচর' নামে এক উল্লেখযোগ্য স্থান। সমুদ্রতট থেকে মাত্র ৩,০০০ ফুট উঁচুতে। প্রশস্ত সমতল ভূমি। চাষাবাদ আছে। কলা-বাগান দেখা গেল। তৃণাচ্ছাদিত সুবিস্তৃত মাঠও রয়েছে। ১৯৩৬ সালে এখানে বিমান-পোত অবতরণের এক ক্ষেত্র ছিল। হরিদ্বার থেকে বিমানপোত যাতায়াত করতো। এখন এখানে দেশরক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে সৈন্য সমাবেশ ও বহু সাঁজোয়া গাড়ি রয়েছে দেখা গেল। আরও ছয় মাইল গিয়ে 'কর্ণ-প্রয়াগ'। দোকান বাজারের সমারোহ। নীচে নদীতীরে এক সুদৃশ্য মন্দির। এইস্থানে নাকি সূতপুত্র কর্ণ সূর্যদেবের দর্শনলাভ ক'রে অভেদ্য কবচাদি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এখান থেকে আর একটা পথ বেরিয়ে গিয়েছে এগার মাইল দূরে অবস্থিত 'আদ্-বদরী' বা 'আদি-বদরী' পর্যন্ত। সে পথ পাশে রেখে আমাদের 'বাস্' এগিয়ে চললো।

সাত মাইল এসে পেলাম 'নন্দপ্রয়াগ'। সমুদ্রতট থেকে ২,৮৮০ ফুট মাত্র উঁচুতে। এটা একটা 'ক্রসিং স্টেশন'। এখানে বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল। অবতরণশীল সমস্ত গাড়ি এসে পৌছলে তবে এদিকের গাড়ি ছাড়লো। হুইশিল-মুখে পুলিস যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করছে। এখানে নন্দা ও অলকানন্দার মিলন-ক্ষেত্র। রাজা নন্দ ও রমাপতির মন্দির আছে। এখানে সাড়ে নটায় বেশ গরম বোধ হ'তে লাগলো। আরও সাত মাইল এসে পেলাম 'চামৌলি'। সমুদ্রতট থেকে ৩,৮০০ ফুট উঁচুতে। এখানে জেলা আদালত, কালেকটারী, পুলিসের থানা, হাসপাতাল, স্কুল, পোস্টাপিস, টেলিগ্রাফ আপিস, ডাক-বাংলো প্রভৃতি রয়েছে দেখা গেল। এই স্থানের নাম আগে ছিল 'লাল-সাঙ্গা'; লাল রং-এর এক বিরাট পুল ছিল বলে। সে পুলের রং বদলে এখন সাদা হয়েছে। চামৌলি নাম বেশ মিষ্টি নাম। কেমন আবেশ জাগানো নাম। কিন্তু আবেশ নয়, চমক জাগলো চারিপাশে, প্রচণ্ড কর্মচাঞ্চল্য দেখে এই হিমালয়ের বুকে। প্রশস্ততর পথ প্রস্তুত হচ্ছে বড় বড় 'রোলার' 'বুল-ডোজার' প্রভৃতির সহায়তায়।

এর পর এলাম 'পিপুল-কোঠি'। ৪,০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। এও বেশ বড় নামকরা জায়গা। প্রবোধ এণ্ড কোং-এর পেট্রল পাম্প রয়েছে

পথের ধারে। আমাদের 'বাস্' চলেছে 'যোশীমঠে'র দিকে এগিয়ে। একের পর এক গরুড়-গঙ্গা, গুলাব-কোঠি, হেলাং ছাড়িয়ে এসে এক অপ্রত্যাশিত বিরাট বাধার সম্মুখীন হ'তে হ'ল আমাদের। এক মহা মহীরুহ ঝড়ে ভেঙে গিয়ে বিশাল ডালপালাসহ পথ অবরোধ করে পড়ে রয়েছে। সারি সারি বহু 'বাস্' ও 'ট্রাক' দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সাধারণের সাধ্যাতীত সেই বাধা অপসারণ। দ্বিধা-সংশয়ে সমাচ্ছন্ন আমাদের মন। সহজেই হয়ে পড়ে উদ্বিগ্ন। আবার মনে পড়লো চক্রধারী নারায়ণের কথা। তাঁর দর্শন পাওয়া কি সহজসাধ্য? ভাবনা হ'ল আজও কি আবার নিরাশ্রয় অবস্থায় পথে রাত কাটাতে হবে? না, 'বাস্' তো রয়েছে। তার ভিতরে না হয় বসে বসে রাত কেটে যাবে। ঐ বিরাট পাদপ-রাজ্যের ভূপতিত দেহ কী করে হবে অপসৃত?

বেশীক্ষণ চিন্তা করতে হ'ল না। সৈন্যবিভাগের কয়েকজন একটা 'ওয়েপন্-কেরিয়ার' গাড়িতে ওদিকে এসে পৌছলেন। তাঁদের পেশী-সমৃদ্ধ বলিষ্ঠ নিপুণহস্তে পরিচালিত কুঠার ও করাত ভূপতিত মহীরুহকে অপসারণযোগ্য কয়েক খণ্ডে পরিণত করলো। অপসারিত হ'ল অবরোধ। তখন আমরা 'বাস্' যোগেই 'যোশীমঠে'র দিকে অগ্রসর হ'লাম। অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটায় 'যোশীমঠে' এসে পৌছলাম। শঙ্করাচার্যের জ্যোতির্মঠ হয়েছে 'যোশীমঠ'। অল্পক্ষণ আগে পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় আমাদের যে মানসিক উদ্বেগ হয়েছিল, সেকথা মনে করে স্মরণ হ'ল আচার্য শঙ্করের আশ্বাস-বাণী:—'বাতুলঃ তব কিং নাস্তি নিয়ন্তাঃ?" নিয়ন্তা আছেন বই কি। প্রয়োজন মত ঠিক সময়ে সব ব্যবস্থাই হয়ে যায়। তবুও মনের ভুলে ভাবনার অন্ত থাকে না।

॥ আবার হাঁটাপথে ॥

যোশীমঠ সমুদ্রতট থেকে ৬,১০০ ফুট উঁচুতে। এর চারিদিকে পাহাড়। অথচ বেশ প্রশস্ত পথ। সংখ্যাহীন 'বাস্' ও ট্রাক যাতায়াত করছে। ঘাঁজোয়া গাড়িও রয়েছে। সৈন্য বিভাগের ছাউনি আছে এখানে। বড় বড় অট্টালিকা, বাগান, দোকান, বাজারে সরগরম। বিকেলে বেশ গরম বোধ হ'ল। আচার্য শঙ্করের জ্যোতির্মঠ এখনও বিদ্যমান। বহু উর্ধ্বে পাহাড়ের এক

চূড়ায়, কোলাহলের বাইরে, আপন মহিমান্বিত নীরব গাম্ভীর্যে। পাহাড়ের গায়ে উদ্যান-সমন্বিত সৌধ আছে এখানে বহু সংখ্যক। কিছু উপরে বিরাট সুসজ্জিত প্রাসাদ—বিড়লা-ভবন। সুবৃহৎ গোলাপ ফুটে আছে প্রায় প্রত্যেক উদ্যানে। বৈদ্যুতিক আলোয় সন্ধ্যার অন্ধকার যখন বিদূরিত হ'ল, তখন ভাবলাম, এ কোথায় এলাম? এই কি আচার্য শঙ্করের সুবিখ্যাত তপোভূমি?

আমাদের ডাণ্ডীবাহকেরা আগেই এখানে এসে গিয়েছে। এদের বাড়ি দেব-প্রয়াগে। বড় ভাল লোক এরা।

পরদিন ২৩শে মে সকালে চা ও জলযোগের পর বদরীনারায়ণের পথে রওনা হলাম। কেউ ডাণ্ডীতে, কেউ পদব্রজে, কেউ অশ্বারোহণে, কেউ কাণ্ডীতে। প্রথমেই এক অতীব কষ্টসাধ্য বিপদসঙ্কুল উৎরাই পথ। তাকে পথ বলা চলে না। যাত্রীপথ বিলুপ্ত। নূতন প্রশস্ত পথ নির্মীয়মাণ, সৈন্য চলাচলের প্রয়োজনে। ফলে, বদরীনারায়ণ পর্যন্ত উনিশ মাইল দূরত্ব আমাদের অতিক্রম করতে হয়েছিল, কি চড়াই, কি উৎরাই, সর্বত্র অতি সন্তর্পণে ভগ্ন প্রস্তরের বিক্ষিপ্ত স্তূপের উপর দিয়ে। প্রতি মুহূর্তে পদস্খলনের সম্ভাবনা। তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত ছিল আর এক সম্ভাবনা—বহু নিম্নে তীব্র বেগে প্রবহমাণা অলকানন্দার তুষার-শীতল সলিলে নিমজ্জনের।

যোশীমঠ থেকে খাড়া উৎরাই পথে নেমে আমরা এলাম 'বিষ্ণু-প্রয়াগে'। বিষ্ণু-গঙ্গা এখানে মিলিত হয়েছে অলকানন্দায়। পুরাকালে দেবর্ষি নারদ এই স্থানে নাকি বিষ্ণুর আরাধনা করে সর্বজ্ঞ হওয়ার বরলাভ করেছিলেন। একটি ছোট বিষ্ণুমন্দির আছে, খানিকটা নেমে গিয়ে। মাথা নীচু না করলে সে মন্দিরে প্রবেশ করা যায় না, এত ছোট তার প্রবেশ-দ্বার। অলকানন্দার উপর সুদীর্ঘ সেতু আছে। ১৯৫৫ সালে নির্মিত। সশস্ত্র রক্ষী উভয় পার্শ্বে প্রহরারত। এপারে এসে পথ উঠে গেছে এঁকে-বেঁকে ঊর্ধ্ব দিকে। পাহাড়ের গা বেয়ে সরু পায়েচলা পথ, কোথাও এক হাত, কোথাও আধ হাত চওড়া। কোথাও বা নিম্নে প্রবাহিতা নদীর দিকে সে পথ ঢালু বেয়ে নেমে গিয়েছে; খুব সম্ভব পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসা জলস্রোতের চাপে। এ পথে চলবার সময় ভয় ও ভরসা দুই-ই ছাড়তে হয়। মনে মনে গুরুর নাম জপ করতে করতে চলেছিলাম। দৃষ্টি সর্বদা সম্মুখে নিবদ্ধ। নীচের দিকে চাইতে গেলেই মনে হয় যেন দুর্নিবার আকর্ষণে টানছে তীব্রবেগে ধাবমানা স্রোতস্বিনী।

চার মাইল পথ সন্তর্পণে অতিক্রম করে বেলা দশটার একটু পরে আমরা

'ঘাট' চটিতে এসে পৌঁছলাম। এ-স্থান অনেক নীচে। আমাদের যেখানে থাকতে হয়েছিল তার কাছেই প্রায় সমতল ভূমিতে অলকানন্দার ঘাট। অনেকেই সেখানে স্নানের জন্য নেমে গেলেন। এই 'ঘাট' চটিতে একটি ঘটনা হয়েছিল, যার উল্লেখ ফিরবার পথে এক অত্যন্ত দুঃখজনক কলহে বিশেষ লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় হয়েছিল। কলকাতার গোকুল দে মহাশয় হাঁটাপথে পদব্রজে আসছিলেন, পথে এক বিপদ্‌জনক স্থানে ভারবাহী ঘোড়ার ধাক্কায় তিনি খানিকটা নীচে পড়ে যান। পায়ে ও মাথায় আঘাত লাগে। ভাগ্যক্রমে একটা বড় পাথরে দেহ আটকে যাওয়ায় রক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁকে কয়েকজন ধরাধরি করে তুলে এনে 'ঘাট' চটিতে যখন শুইয়ে দেয় তখন আমাদের সহযাত্রী শিউরতনজী তাঁর খুব সেবা করেন, পায়ে স্বহস্তে ঔষধ মালিশ করেছেন।

খুবই দুঃখের কথা যে ২৯শে মে ঋষিকেশে ফিরে এসে যখন আমরা আমাদের পূর্বোক্ত ট্যুরিস্ট কোচে প্রবেশ করি, তখন কলকাতার যে অফিসারবাবু যাত্রাপথে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে অসুস্থ বোধ করে ফিরে যান তাঁর খালি হওয়া বেঞ্চে শিউরতন-গৃহিণী তাড়াতাড়ি নিজের বিছানা বিছিয়ে দখল করে নেন; গোকুলবাবু তাতে প্রতিবাদ করে বুঝি বলেছিলেন, আসবার সময় তাঁর জন্য নির্ধারিত ঐ বেঞ্চ একজন দখল করে নিয়েছিলেন, আবার ফিরে যাবার সময় ওঁরা জোর করে সেখানে বিছানা পাতছেন, এটা খুব অন্যায়। আর যায় কোথায়? শিউরতন-গৃহিণী রণরঙ্গিণী মূর্তিতে দাঁড়িয়ে কলহে প্রবৃত্ত হন। কথায় কথা বাড়ে। পরস্পর দম্ভোক্তি চলে কিছুক্ষণ। তারই ভিতরে শিউরতন-গৃহিণী আপন পায়ের হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে বলেন যে তাঁর পা টিপে দেওয়ার জন্য গোকুলবাবুর মত বিশ-পঁচিশজন চাকর রাখতে পারেন তিনি; আর তারই উত্তরে গোকুলবাবু আত্মবিস্মৃত হয়ে বলে ফেলেন—"তোমার স্বামী চাকরের মত আমার পা টিপে দিয়েছে ঘাট চটিতে।" সকলে হায় হায় করে উঠলাম। এ কী করলেন গোকুলবাবু? বরফের মধ্যে আগুন থাকতে পারে, কিন্তু ৫৬ ইঞ্চি চওড়া বুকের ভিতর নীচতা থাকবে কেন? আশ্চর্যের বিষয় এঁরা দুই পক্ষই বৈষ্ণব। বাইরের তিলক-সেবা, মালা জপ করা কিছুই অন্তরের ক্রোধাসুরকে আয়ত্তে রাখতে পারেনি।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতায় আছে—"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ, কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ।" আত্মনাশন দুর্জয় রিপু ক্রোধ

সত্যসত্যই নরকের দ্বার। শ্রীশ্রীকেদার-বদরী তীর্থ-পর্যটনের পরে ট্রেনের কামরায় ঐ দুই ক্রোধান্ধ নর-নারী সেদিন যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন তাকে নরক ছাড়া আর কি বলতে পারা যায়? তা নরকই। বেচারী শিউরত্তনজী নিতান্ত ভালমানুষ। তিনি একান্ত অসহায় ভাবে সব দেখছিলেন, শুধু মাঝেমাঝে গোকুলবাবুর দিকে ফিরে বলছিলেন, 'তুমার লজ্জা নেই।' নিজের স্ত্রীকে কিছু বলার ক্ষমতা বা সাহস ছিল না।

কারই বা থাকে? যিনি দেবাদিদেব শিব-শম্ভু, তিনিও তাণ্ডবনৃত্য-পরা কালীর পদতলে বুক পেতে দিয়ে শবের মত পড়ে থাকেন। মজা দেখছিলেন বাইরে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ-ভারতীয় ও মধ্য-ভারতীয় বহু তীর্থযাত্রী মেয়ে ও পুরুষ। তাঁদের সংরক্ষিত তীর্থযাত্রী স্পেশালের গাড়ি পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমরা মরমে মরে যাচ্ছিলাম। ঐ নাটকের শেষ দৃশ্য আরও অদ্ভুত। কলহের মধ্যে হঠাৎ দেখা গেল শিউরতনজীর বাঙ্গালী 'মুনিম' শীর্ণদেহ এবং খঞ্জ কালীকেষ্ট দাস যেন লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসেন গোকুলবাবুকে প্রহার করতে। প্রভু-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাই তার উদ্দেশ্য।

বলিষ্ঠদেহ গোকুলবাবু এক হাতে তার ঘাড় ধরে একটি ধাক্কা দেন; ফলে বার তিনেক ডিগবাজী খেয়ে ট্রেনের কামরার ভিতরেই কিছুক্ষণ অনড় অবস্থায় অবস্থিতি হ'ল তার। আমার কন্যা অঞ্জলি উপস্থিত বুদ্ধিতে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল; নতুবা নীচে পড়ে গেলে কালীকেষ্টর সদ্য সদ্য 'কেষ্টপ্রাপ্তি'র সম্ভাবনা ছিল। বোলপুরের শ্রীমতী রাণী সরকার এই সব দেখে বিবদমান দুই পক্ষের সামনে তাঁর হাত দুখানি ঘুরিয়ে বলেছিলেন,—"ছি, ছি, আপনাদের এত-এত টাকা খরচ করে তীর্থে যাওয়া সব বৃথা হ'ল; সব টাকা জলে পড়লো।"

যাক্, এসব অনেক পরের ঘটনা। এখন আমরা শ্রীশ্রীবদরীবিশাল দর্শনে চলেছি। এবং সেই পথে 'ঘাটে' এসে পৌছেছি। ঘাটেই বটে। আর কি? প্রায় এসে গেছি। এখান থেকে দুই মাইল গেলে 'পাণ্ডুকেশ্বর'; সেখান থেকে ছয় মাইল গেলে 'হনুমানচটি'; তার পর আর পাঁচ মাইল গেলেই শ্রীশ্রীবদরীনাথধাম। 'পাণ্ডুকেশ্বর' ও 'হনুমানচটি'র মাঝে আছে 'লামবগড়।' অতি মনোরম স্থান।

'ঘাট' চটি থেকে স্নানাহারের পর বিকেল তিনটায় আমরা রওনা হলাম। গোকুল দে মহাশয় অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। তাঁর জন্য ম্যানেজার একটা ডাণ্ডী

যোগাড় করে দিলেন আর তাঁর স্ত্রীর জন্য একটা ঘোড়া। বড় শান্ত প্রকৃতির সজ্জন লোক এঁরা। বিত্তশালীও। কলকাতার ভবানীপুরে নামকরা জুয়েলারী দোকান আছে গোকুলবাবুর। এঁরা পদব্রজে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেছিলেন তীর্থযাত্রা বলে। আর গোকুলবাবু বলতেন—সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় মানুষের কাঁধে যাবেন না। তাঁর সে সংকল্প রইল না।

'ঘাট' চটি থেকে এক মাইল এসে 'গোবিন্দঘাটে' পৌছলাম। এখান থেকে অলকানন্দার অপর পারে গিয়ে রাস্তা আছে 'হেমকুণ্ড,' 'লোকপাল,' ও বিশ্ববিখ্যাত 'নন্দনকাননে' যাওয়ার। 'নন্দনকানন' এখান থেকে সাড়ে নয় মাইল। একটি ঘোষণাপত্র টাঙ্গানো রয়েছে দেখা গেল যে 'নন্দনকানন' যেতে হ'লে যোশীমঠের মহকুমা হাকিম অথবা তহশীলদারের কাছ থেকে অনুমতি-পত্র নিতে হবে; নতুবা গমন নিষিদ্ধ। 'হেমকুণ্ডে' নাকি সপ্ত-শৃঙ্গ পর্বত-চূড়া বেষ্টিত এক মনোরম হ্রদ আছে। ত্রেতাযুগে সেখানে লক্ষ্মণ নাকি বহু যুগ ধরে তপস্যা করেছিলেন। লক্ষ্মণের নামে একটি স্মারক মন্দির আছে। শিখেদের ধর্মগুরু গুরুগোবিন্দ সিংহ ঐস্থানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করে-ছিলেন। একটি গুরুদ্বারাও আছে। 'লোকপাল' 'হেমকুণ্ড' সমুদ্রতট থেকে ১৪,২৫০ ফুট উর্ধ্বে অবস্থিত। সেখানকার দৃশ্য নাকি অতীব মনোরম। সে সব কিছু দেখা হ'ল না। অবশ্য দেখার কথাও ছিল না। গোবিন্দঘাট পেরিয়ে আরও এক মাইল এসে পেলাম 'পাণ্ডুকেশ্বর'। সমুদ্রতট থেকে ৬,০০০ ফিট উর্ধ্বে অবস্থিত। পাণ্ডু রাজা ঋষির শাপে অভিশপ্ত হয়ে এই স্থানে দুইটি মন্দির নির্মাণ করেন এবং তাতে নারায়ণ (যোগ-বদরী) ও শিবলিঙ্গ স্থাপন করে শাপ-মুক্তির জন্য আরাধনা করেছিলেন। সে শিব-মন্দির আর নেই। জ্যোতির্ময় চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তির সম্মুখে এক শিব-লিঙ্গ স্থাপিত আছে। মন্দির অবশ্য পাশাপাশি দুটিই আছে। মন্দির-চূড়ায় জোড়াসিংহ। ভারত সরকার কর্তৃক Protected National Monument বলে ঘোষণাপত্র স্থাপিত রয়েছে মন্দিরপ্রাঙ্গণে।

পাণ্ডুকেশ্বর বেশ বড় শহর। বহু ঘরবাড়ি, কুড়িটি চটি ও দুটি ধর্মশালা আছে এখানে। বদরীনাথ অভিমুখে যাত্রাপথে আমরা এখানে থামিনি ও থাকিনি। ফিরবার সময় ছিলাম। সে সময়ে আমাদের থাকতে হয়েছিল মন্দিরের ঠিক সামনে একটা চটির দোতলায়। বেশ ভাল ও পরিচ্ছন্ন ধর্মশালা কাছেই ছিল, তাতে ঘরও খালি ছিল। কিন্তু কুণ্ডু স্পেশালের নিজস্ব পাণ্ডার

ছড়িদার শ্রীপাল সিং (কেউ কেউ বলতেন, তার চাতুর্যের জন্য, শৃগাল সিং) চটিওয়ালার কাছ থেকে আহার্য দ্রব্যাদি কিনিয়ে যে কমিশন পাবেন তারই লোভে ধর্মশালার পরিবর্তে অপরিচ্ছন্ন চটিতেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করতেন। উপায় কি? যে আগে আগে গিয়ে আমাদের থাকার ঘর ঠিক করছিল সে কেন তার দু পয়সা বেশী পাওয়ার উপায় পরিত্যাগ করবে? যাক্, আমাদের তাতে বিশেষ কোনও অসুবিধা হয়নি। তবে কলকাতার জুয়েলার মশাই ওরফে বিপুলবাবু সপরিবারে ও স-আয়ার মন্দির কমিটির ধর্মশালায় একটি ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে রাত্রিযাপন করেছিলেন। এসব পরের কথা। ফিরবার সময়ের ঘটনা।

এখন ২৩শে মে আমরা পাণ্ডুকেশ্বরে না থেমে এগিয়ে চলেছি। পথের ধারে একটি সুন্দর 'রামানুজ আশ্রম' দেখতে পেলাম। যোগীরাজ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ কর্তৃক স্থাপিত 'রঘুনাথ আশ্রম' রয়েছে সেখানে। তার পর বিনায়ক চটি ছাড়িয়ে যারপরনাই দুরারোহ ও কষ্টসাধ্য পথে বিকেল পাঁচটায় এসে পৌছলাম 'লামবগড়ে'। কখনও খাড়া চড়াই, কখনও বিপজ্জনক উৎরাই। বড় বড় পাথরের উপর সন্তর্পণে পা ফেলে, স্থানে স্থানে প্রবল জল-স্রোত পেরিয়ে, কখনও বা জমাট বরফের উপর দিয়ে হেঁটে আমাদের আসতে হচ্ছিল। ঐ পথ অবর্ণনীয়। পূর্বের যাত্রীপথ বিলুপ্ত। নূতন পথ নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত কষ্টভোগ ও বিপন্ন হওয়া অনিবার্য। তাই এ বৎসর যাত্রী আগমন নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিলেন উত্তরপ্রদেশ সরকার। জানিয়েছিলেন নিষেধ সত্ত্বেও যাঁরা আসবেন তাঁরা পথে বিলম্বিত ও বিপন্ন হতে পারেন। তবুও অল্পসংখ্যক যাত্রী গিয়েছিলেন; পথে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল তাঁদের; কিন্তু পর্যাপ্তভাবে পুরস্কৃতও হয়েছিলেন তাঁরা।

লামবগড়ে মনোরম নৈসর্গিক পরিবেশের মধ্যে সুরম্য আরামপ্রদ বিশ্রাম ভবনে আমরা একরাত্রি অবস্থান করলাম। সর্বপ্রকার শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের আধুনিক উপকরণ সমন্বিত এই দ্বিতল সুবিশাল বিশ্রাম-ভবন নির্মিত হয়েছে ১৯৫৮ সালে। ব্যয়ভার বহন করেছেন শ্রীশ্রীবদরীনাথ মন্দির কমিটি। এই বিশ্রাম ভবন ছোট একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। দ্বিতলে সুপ্রশস্ত 'হলঘর' ও কয়েকটি শয়নকক্ষ ভি-আই-পি জনোচিত গৃহসজ্জায় সুসজ্জিত। মেঝেয় পুরু বহুমূল্য গালিচাপাতা, খাট বিছানা, চেয়ার টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, সোফা-কৌচ, সব উৎকৃষ্ট সেগুন কাঠের। প্রতি দরজায় সুদৃশ্য ভারী পরদা। শয়ন-

গৃহ সংলগ্ন স্নানাগার ও কমোড-সহ শৌচাগার। আমরা সাধারণ যাত্রী হিসাবে নীচের তলায় যে ঘরগুলি পেয়েছিলাম তাও যথেষ্ট আরামদায়ক। কাচের শার্সী দেওয়া জানালা ও দরজা আছে। মেঝের পুরু সতরঞ্চি পাতা। এখানে রাত্রে খুব ঠাণ্ডা বোধ হ'লেও কোনও কষ্ট হয়নি। বরং সুনিদ্রা হয়েছিল; খুব ভালোই লেগেছিল। এখানে এসে বিকেলবেলাই পরিচয় হ'ল এক প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবারের সঙ্গে। ডাঃ হিমাংশু কর, তাঁর স্ত্রী, দুই কিশোর বয়স্কপুত্র ও এক ভ্রাতাসহ চলেছেন বদরীনাথ দর্শনে, পদব্রজে। ভারী সুন্দর অমায়িক প্রকৃতির এঁরা। ভদ্রলোক ডাক্তারী করেন রায়-বেরিলীতে। কেদার-বদরী তীর্থদর্শন এর আগে আরও দুবার তাঁদের হয়েছে; এবার তৃতীয়বার। হিমাংশু-বাবুর এক কাকা শ্রীদিব্যেন্দু কর এলাহাবাদে থাকেন এবং তিনি নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পরিচালক সমিতির সদস্য। মনে পড়লো মাদ্রাজ অধিবেশনে এবং পরে আমেদাবাদে ও গোরক্ষপুরে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

২৪শে মে শুক্রবার সকালে তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে নিয়ে সাড়ে নয়-টায় লামবগড় থেকে রওনা হলাম। এইবার একেবারে সোজা বদরীনাথ। বিপুলবাবু সম্ভবতঃ সকলের আগে সেখানে পৌঁছে ভাল ঘর দখল করার উদ্দেশ্যে স-পরিবার ও স-আয়ার না খেয়েই রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা ধীরে সুস্থে প্রসন্ন ও প্রশান্ত মনে চলেছি। বেলা এগারোটায় 'হনুমান চটি' পার হলাম। এর অপর নাম বৈখানস-তীর্থ। রাজা বৈখানস এইস্থানে রামরূপে বদরীনারায়ণের পূজা করেছিলেন। কথিত আছে রাম-রাবণ যুদ্ধের অবসানে অঞ্জনা-নন্দন এই স্থানে বসবাস করেন। পরবর্তী যুগে ভীমের শক্তিমত্তার দর্প চূর্ণ করতে স্বীয় লাঙ্গুল প্রসারিত করে তাঁর গমন পথ অবরোধ করেছিলেন। ভীমের ভীম পরাক্রম ব্যর্থ হয়েছিল সেই অবরোধ-অপসারণের প্রচেষ্টায়। এই পর্বতের একপার্শ্বে 'ঘৃত-গঙ্গা', অপর পার্শ্বে 'ক্ষীর-গঙ্গা' প্রবাহিতা।

আমরা মহাবীর দর্শন করে এগিয়ে গেলাম। প্রায় দু মাইল পরে এক বিস্তীর্ণ তুষার-ক্ষেত্রের সম্মুখীন, হতে হ'ল। বিপদসঙ্কুল পথ। 'জয় বদরী-বিশাল কী জয়' ধ্বনি সহকারে যাত্রীদল চলেছে এই দুর্গমপথে। ভীষণ চড়াই পথ। কিছুদূর গিয়ে একটি ছোট্ট চটি দেখা গেল। নাম বোধ হয় 'আরাম-চটি'; ডাণ্ডীবাহকেরা বললে;—'আড়হাম চটি'। আর মাত্র চার মাইল গেলেই বদরীনাথ ধাম। কিন্তু এই শেষ পরীক্ষা। বড় কঠিন পরীক্ষা। পথের সরু রেখা এঁকে-বেঁকে চলেছে উপরের দিকে; খাড়া চড়াই সে পথ। বহু স্থানে

বিরাট বরফের স্তূপে আবৃত। বরফস্তূপের নীচে বরফ গলে গিয়ে মাঝে মাঝে যে সব গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে, অসাবধানে তার ভিতর পা বসে গেলে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্তির সঙ্গে তুষার-সমাধিরও সম্ভাবনা আছে। ঐ পথে গুরুদেবের সর্ববিঘ্নহর নাম স্মরণ করে অগ্রসর হলাম। তিনিই তো নিয়ে যাচ্ছেন। গঙ্গোত্রী-নিবাসী দণ্ডিস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী। দোল-পূর্ণিমায়, ১২৯৪ সালে ১৬ই ফাল্গুন মেদিনীপুর জেলায় জগৎপুর গ্রামে পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম। বৈশাখী পূর্ণিমায় ১৩৪৮ সালে ২৮শে বৈশাখ পূর্ব-সংকল্প ও ঘোষণা অনুযায়ী নরদেহ পরিত্যাগ করে দিব্যধামে প্রয়াণ। তাঁর শেষ পত্রে লিখিত আশ্বাস-বাণী মনে হ'ল—"স্মরণ রাখিও আমি সর্বদা তোমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিব।" তিরোহিত হ'ল ভয় ও ভাবনা। খাড়াই ওঠা শেষ হ'ল। উচ্চ পর্বতশিখরে দেখি কী সুন্দর সুবিস্তীর্ণ সমতলভূমি! বেগুনী ও হলদে রং-এর অজস্র পুষ্প স্তবকে ছেয়ে গিয়েছে অনেকখানি স্থান। যেন বিভিন্ন বর্ণের গালিচা বিছানো রয়েছে। অল্পক্ষণ সেখানে বসে বিশ্রাম করা হ'ল। ডাণ্ডীবাহকেরা রাশি রাশি ফুল সংগ্রহ করে আমাদের দিল। তারপর সামান্য পথ এসে দেখা গেল একখানি বড় পাথরের উপর একটি পতাকা উড্ডীয়মান। কাছে ছোট একটি ঘর। ডাণ্ডীবাহক শোভন সিং এইখানে আমাদের ডাণ্ডী থেকে নামতে বললে। বলল :—"এই কুবেরশিলা, এখানে প্রণাম করে পায়ে হেঁটে এগিয়ে যান। এক মাইল গেলেই বদরীনাথধাম।" তথাস্তু। কন্যা অঞ্জলি ও আমি চললাম আগে আগে, পায়ে হেঁটে। দেখতে পেলাম দূরে ছোট ছোট খেলাঘরের বাড়ির মত অসংখ্য ঘরবাড়ি। পথ এঁকে-বেঁকে ক্রমশঃ নেমে গিয়েছে। চলেছি আর মাঝে মাঝে বলছি 'জয় বদ্রীবিশাল'! কী আনন্দ! কী পরিতৃপ্তি! এই তো এসে গিয়েছি বহুবাঞ্ছিত তীর্থরাজ বদরীনাথ ধামে। ঐ দেখা যাচ্ছে শ্রীমন্দিরের শীর্ষভাগ। আনন্দাশ্রু চোখের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দিতে লাগলো। একটুও কিন্তু ক্লান্তি বোধ ছিল না আর। এক অবর্ণনীয় স্বর্গীয় আবেশে শরীর ও মন পরিপূর্ণ।

॥ শ্রীশ্রীবদরীনাথ দর্শন ॥

অপরাহ্ণ দুটোয় এসে পৌঁছলাম আমাদের জন্য নির্দিষ্ট পাণ্ডার যাত্রীভবনে। পাণ্ডার নাম শ্রীধীরেন ভট্ট। এত অমায়িক, নির্লোভ, ভদ্র প্রকৃতির পাণ্ডা সচরাচর দেখা যায় না। কী সুমিষ্ট ব্যবহার! তাঁর দ্বিতল যাত্রী-ভবনে মধ্যবর্তী সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডানদিকের একপ্রস্থ শয়নকক্ষ ও তৎসম্মুখস্থ আর একটি ঘর আমাদের ব্যবহারের জন্য দিলেন। ভাড়ায় নয়, এমনি। দুটি ঘরেই সতরঞ্চি ও তার উপর পুরু গালিচা পাতা। পাণ্ডা মহাশয় স্বয়ং দাঁড়িয়ে থেকে সব ব্যবস্থা করে দিলেন। বললেন, "ভিতরের ঘরে রাত্রে শয়ন করবেন, আর সামনের ঘরে দিনে থাকবেন।" সামনের ঘরটির ঠিক নীচে রাস্তা। সেই রাস্তা একটু ঘুরে নেমে গিয়েছে, পোস্টাপিসের পাশ দিয়ে গিয়ে মন্দিরগামী বড় রাস্তায় মিশেছে। সামনেই অলকানন্দা ও ঋষি-গঙ্গার সঙ্গমস্থল।

অলকানন্দার পশ্চিমপারে অবস্থিত পর্বতের নাম 'নারায়ণ' পর্বত। এই পর্বতের উপর রয়েছে শ্রীশ্রীবদরীনাথের শ্রীমন্দির, আমাদের বাস ভবন থেকে মিনিট পাঁচেকের পথ, উত্তর দিকে। সে পথ প্রশস্ত ও সমতল। তার দুই ধারে দোকান বাজার। খাবারের দোকান, ছবির দোকান, শিলাজিৎ, জীবন-রক্ষকচূর্ণ প্রভৃতি ওষুধের দোকান, চামর ও চামড়ার দোকান, বই-এর দোকান সবই আছে। অলকানন্দার পূর্ব পারে যে পর্বত তার নাম 'নর'। পুরাকালে 'নর' ও 'নারায়ণ' নামে দুই ঋষি নাকি এখানে তপস্যা-নিরত ছিলেন। সুদীর্ঘকাল তাঁদের কোনও সংবাদ না পেয়ে তাঁদের মাতা 'মূর্তি' ও পিতা 'ধর্মরাজ' অনুসন্ধান করে করে এখানে এসে তাঁদের দেখতে পান। পাছে পিতামাতা তাঁদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান সেই ভয়ে ঋষি নর ও নারায়ণ দুইটি পর্বতে রূপান্তরিত হন।

পাণ্ডা মহাশয় আমাদের দেখালেন পশ্চিমদিকে তুষারশীর্ষ 'নীলকণ্ঠ' পর্বত। শ্রীশ্রীকেদারনাথের মন্দির ও শ্রীশ্রীবদরীনাথের মন্দিরের মধ্যে সোজাসুজি মাত্র পাঁচ মাইলের ব্যবধান। আগেকার দিনে নাকি একই পুরোহিত কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ দুই মন্দিরে পূজা করতেন। পরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সংযোজক পর্বত বিধ্বস্ত হওয়ায় ঐ দুই মন্দিরের ব্যবধান হয়েছে একশত মাইলের অধিক।

শ্রীশ্রীবদরীনাথ ধাম আসবার সময় অলকানন্দার পূর্ব ধার দিয়ে আসতে

হয়েছে। পূর্বধার থেকে পশ্চিমধারে আসবার জন্য এক সুন্দর সুদৃঢ় লৌহসেতু আছে। উনিশশো একচল্লিশ সালে ঐ সেতু নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন শেঠ গোবর্ধন দাস নামে এক ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ী। সাধু শেঠ গোবর্ধন দাস। এঁরা অর্থ অর্জন করেন অপরিমিত, এঁদের দানও অপরিসীম। তীর্থের পথে কত সেতু, কত ধর্মশালা নির্মাণ করে দিয়েছেন এঁরা, কত সদাব্রতের ব্যবস্থা করেছেন!

সেতুর মুখেই রামানুজ সম্প্রদায়ের সুদৃশ্য মঠ দেখা গেল। কাছেই সঙ্কট-মোচন মহাবীরের মন্দির। এই নর-পর্বতের উপর কয়েকটি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভবন আছে;—যথা বেদান্ত-কুটির, নারায়ণ স্বামী পরমহংসের যজ্ঞশালা প্রভৃতি। সেদিকেও একটি অপ্রশস্ত সেতু আছে। তার উপর দিয়ে এপারে এলে ঠিক বদরীনাথ মন্দিরের সামনে তপ্তকুণ্ডের পাশে আসা যায়।

শেঠ গোবর্ধন দাস কর্তৃক নির্মিত সেতুমুখে এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি দেখা গেল। বদরীনাথধাম ছাড়িয়ে যদি কোনও যাত্রী আরও উঁচুতে অর্থাৎ বহুধারা, শতোপন্থ অথবা মানা অভিমুখে যেতে চান, তাহলে তাঁকে যোশীমঠের মহকুমা হাকিম অথবা তহশীলদারের লিখিত অনুমতি পত্র এখানে দেখাতে হবে, এবং একটি খাতায় নিজ নাম, ধাম, প্রয়োজন লিপিবদ্ধ করতে হবে; তবে যেতে পাবেন। তা নাহলে ওদিকে যাওয়া নিষিদ্ধ। অবশ্য স্থানীয় লোক, কর্তব্যনিরত সরকারী কর্মচারী এবং ঐ প্রদেশের বিধান সভার সদস্য প্রভৃতির উপর ঐ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়।

'মামা' পর্বতে ছিল মহর্ষি বেদব্যাসের আশ্রম, সেখানে ব্যাস-গুহা আছে। ঐখানে নাকি মহাভারত ও ভাগবত রচিত হয়েছিল। 'মানা'র সন্নিকটে লাল-চীন কর্তৃক অধিকৃত তিব্বত সীমান্ত। সতর্কতার প্রয়োজন মনে হ'ল সেই জন্য। বড় বড় দেবনাগরী অক্ষরে আর একটি বিজ্ঞপ্তি আছে দেখলাম। বদরীনাথ মন্দিরে যাত্রীপ্রদত্ত অর্থ কি কি সৎকাজে ব্যয়িত হয় তার বিস্তৃত ও বিশদ বর্ণনা আছে ঐ বিজ্ঞপ্তিতে। সেই সৎকাজগুলি যাত্রীদের সুখ সুবিধা ও স্বাস্থ্যের সহায়ক। কয়েকটি অপপ্রচারের উল্লেখ করে জনসাধারণের মনে ভ্রান্তি নিরসনের জন্য দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করা হয়েছে— 'ইয়ে প্রচার বিলকুল গলত ব নিরাধার হৈ'—অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন। সর্বত্রই ঐ রকম দেখা যায়। আলো আর অন্ধকার। সৎকার্য ও তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নিন্দা করে তারাই যারা সব চেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছে। শ্রীশ্রীবদরীবিশালের মন্দির, পূর্বেই বলেছি, 'নারায়ণ'

পর্বতে অবস্থিত। ঐ স্থানের উচ্চতা সমুদ্রতট থেকে ১০,২৪৪ ফিট। এখানকার আবহাওয়া অতি মনোরম। কেদারের মত হাড়কাঁপানো প্রচণ্ড শীত নেই এখানে। অল্প পরিসরের মধ্যে প্রায় ৩০০ গৃহ আছে। ধর্মশালাও বেশ কতকগুলি আছে। অতি সুন্দর ব্যবস্থা। শ্রীমন্দিরের ঠিক সামনেই এক সুরম্য আধুনিক প্রথায় নির্মিত বিরাট সৌধে গুজরাটি ধর্মশালা। ব্যবসায়-লব্ধ অর্থসম্ভারের সার্থকতা বটে।

অপরাহ্ণ পাঁচটায় শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হ'ল। সদররাস্তা থেকে অনেক-গুলি সোপান উত্তীর্ণ হয়ে সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে হয় প্রাঙ্গণে। সিংহ-দ্বারের দুই পার্শ্বে কক্ষ। প্রাঙ্গণে নেমে প্রথমেই দেখা যায় এক বেদীর উপর জোড়হস্তে গরুড় মহারাজ রয়েছেন সমাসীন। তাঁর সামনে সামান্য তফাতে নাট-মন্দিরের প্রবেশদ্বার। দুই পাশ থেকে কাষ্ঠবেষ্টনীর মধ্যে অপ্রশস্ত কয়েক ধাপ কাঠের সিঁড়ি উঠে গিয়েছে সেই প্রবেশদ্বার পর্যন্ত। নাটমন্দিরে ঢুকেই বাম পার্শ্বে দেখা যায় অনির্বাণ হোমকুণ্ড। নাটমন্দির ও শ্রীমন্দিরের মধ্যস্থলে বেশ ভারী ও পিতলের কারুকার্য-খচিত দরজা। সেই পথে এগিয়ে গিয়ে দেবদর্শন করতে হয়। তবে বেশ খানিকটা দূর থেকে। এখানকার প্রথা-অনুযায়ী দেব-বিগ্রহের নিকটে একমাত্র পূজারী 'রাউল' ব্যতীত অপর কারো যাবার অধিকার নেই। স্পর্শ করার বা স্বহস্তে পূজা নিবেদন করার প্রশ্নই ওঠে না। মণিকোঠায় রত্নবেদীতে অধিষ্ঠিত দেব-মূর্তি। সেখান থেকে প্রায় ৩০ হাত দূরে এক সুদৃঢ় কাষ্ঠবেষ্টনী আছে। তার বাইরে থেকে সাধারণ দর্শকদের দেব দর্শন করতে হয়। পূজার উপকরণ গ্রহণ করার জন্য সেইস্থানে একজন কর্মচারী থাকেন। বড় বড় থালাও রক্ষিত আছে। কর্মচারীটির ধৈর্যের কিছু অভাব পরিলক্ষিত হ'ল। যাত্রীদের হাত থেকে মাঝে মাঝে পূজার সামগ্রী সহ পাত্র তিনি ছিনিয়ে নিচ্ছিলেন। দিতেই তো এসেছে। দেবেও। তাই কেড়ে নেওয়া একটু বিশ্রী লাগছিল। দেবতা নির্বিকার; সর্বপ্রকার বোধ বিরহিত। কিন্তু তাঁর সেবা যাঁরা বৃত্তি বা উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাঁরা যদি মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন তাহলে তা অবাঞ্ছিত হ'লেও উপেক্ষণীয়।

রাউলকে দেখা গেল মণিকোঠার অভ্যন্তরে। এক কিশোরবয়স্ক সুশ্রী গৌরবর্ণ কুমার। প্রথা অনুযায়ী দাক্ষিণাত্যের নাম্বুদ্রি ও অবিবাহিত ভিন্ন কেহ রাউল পদে নির্বাচিত হ'তে পারেন না। আগে পূজারী বা 'রাউল'ই

ছিলেন এখানে সর্বেসর্বা। এখন তিনি কেবলমাত্র পূজার অধিকারী ; পরিচালন ভার আছে টিহিরি রাজের তত্ত্বাবধানে গঠিত এক ট্রাস্ট কমিটির হাতে।

দূর থেকেই দেখলাম স্নিগ্ধ দীপালোকে রত্নবেদী ও দেবমূর্তি উদ্ভাসিত। মনে হ'ল চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি। যিনি যে ভাব নিয়ে দেখেন তাঁর কাছে ইনি নাকি সেই মূর্তিতে প্রকাশিত হন। আসলে ইনি সকল রূপাতীত বদ্রীনারায়ণ। কেউ দেখতে পান সিদ্ধাসনে বা পদ্মাসনে উপবিষ্ট বিষ্ণুমূর্তি। শৈব দেখতে পান পঞ্চমুখ শিবের মূর্তি। শাক্ত নাকি দেখেন ভদ্রকালীর মূর্তি। জৈন দেখেন তাঁর প্রিয় আরাধ্য নির্বাণ তীর্থঙ্করকে। ভক্ত নিজ নিজ আরাধ্য দেবতাকে দেখতে পান এই বদরীবিশালের শ্রীঅঙ্গে। 'একো নারায়ণঃ ন দ্বিতীয়ো অস্তি কশ্চিৎ'। 'নারায়ণঃ এবেদং সর্বং'; সবই সেই নারায়ণ। তিনিই সর্বত্র বিদ্যমান—বিভিন্নরূপে। এই সত্য প্রতিভাত হয় এখানে এসে শ্রীশ্রীবদরী-বিশালের দর্শনে। কথিত আছে, নারদকুণ্ড থেকে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য দৈবী প্রেরণায় এঁকে উত্তোলন করেন এবং গরুড়শিলার নিম্নভাগে প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁর সর্বপ্রথম পূজারী ছিলেন আচার্য শ্রীমৎ পদ্ম-পাদ। তৎপরে শ্রীমৎ ত্রোটকাচার্য। আচার্য শঙ্করের দুই প্রিয় শিষ্য। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত গরুড়-কোঠিতেই এঁর পূজা-অর্চনা হ'ত। তারপর গাড়োয়ালের তৎকালীন মহারাজা স্বপ্নাদেশ পেয়ে বর্তমান মন্দির নির্মাণ করেন এবং তন্মধ্যে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের শীর্ষভাগ সুবর্ণ-মণ্ডিত করেছেন স্বধর্মনিষ্ঠ পুণ্যবতী রাণী অহল্যাবাঈ। মন্দিরের সংস্কার ও উৎকর্ষ-সাধন তারপরেও অনেক হয়েছে। এখনও হচ্ছে।

শ্রীশ্রীবদরীবিশালের মূর্তির বামপার্শ্বে ঋষি নর ও নারায়ণের মূর্তি। একজন দণ্ডায়মান, অপরজন পদ্মাসনে উপবিষ্ট। দক্ষিণপার্শ্বে কুবের, সম্মুখে উদ্ধব ও গরুড়ের মূর্তি। পশ্চাতে সুদর্শন চক্র। একটি বৃহৎ ঘৃত-প্রদীপ সর্বক্ষণ প্রজ্জলিত। বৈদ্যুতিক আলোও আছে। শ্রীশ্রীবদরীবিশালের নিয়মিত পূজা, অঙ্গরাগ, প্রভৃতি তো আছেই। তদ্ভিন্ন বাইরে থেকে যতবার পূজার দ্রব্যাদি প্রদত্ত হয় ততবার পূজা নিবেদন করা হয় আরতি করে। আরতি প্রায় সর্বক্ষণই হয়।

শ্রীমন্দিরের দক্ষিণদিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কক্ষে লক্ষ্মীদেবীর মন্দির। তৎসংলগ্ন রন্ধনশালা। কথিত আছে এইস্থানে বদরী-বন ছিল ; তাই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য আবিষ্কৃত নারায়ণ-মূর্তি বদরীবিশাল নামে পরিচিত। পার্শ্ববর্তী এক সুবিস্তৃত কক্ষে আচার্য শঙ্করের এক মূর্তি আছে। মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে কীর্তন ও সভা-

মণ্ডপ। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেখানে ধর্মগ্রন্থ পাঠ, আলোচনা ও নাম-কীর্তন হয়। কীর্তন শুনলাম। আয়তনেত্র দীর্ঘাকার শ্বেতশ্মশ্রু এক বৃদ্ধ বীণ হাতে ভজন আরম্ভ করেন। তাঁর পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণের বহির্বাসে আবৃত দেহ এক বলিষ্ঠ ব্যক্তি কণ্ঠসংযোগ করেন ও বাদ্যযন্ত্রে সঙ্গত করেন। কণ্ঠসংযোগ করেন আরও অনেকে। এক অপূর্ব ভাবাবেশ সৃষ্ট হয়।

নাটমন্দিরে দুইপাশে সিদ্ধিদাতা গণপতি আর সংকটনাশন মহাবীরের মূর্তি আছে। আর আছে ক্ষেত্রপালরূপে ঘণ্টাকর্ণের মূর্তি। ঘণ্টাকর্ণ নাকি এককালে শিবের বরে মহাশক্তিধর হয়েছিলেন। শিব-ভক্ত; কিন্তু নারায়ণ-বিদ্বেষী ছিল তাঁর মন। নারায়ণ নামও সহ্য করতে পারতেন না। আপন খেয়ালে মনুষ্য-করোটির মালা গেঁথে গলায় পরতেন; বল্লম হাতে ঘুরে বেড়াতেন। কানে ছোট ছোট ঘণ্টা বেঁধে তাণ্ডবনৃত্য করিতেন, পাছে কোথাও কারো উচ্চারিত নারায়ণ নাম তাঁর কর্ণ-গোচর হয়। কথিত আছে পরম কারুণিক শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণের অহেতুকী কৃপায় তাঁর ঐ বিদ্বেষ ভাব হয়েছিল বিদূরিত; ঘণ্টাকর্ণ রূপান্তরিত হয়েছিলেন বিষ্ণুভক্তে। এবং তাই তাঁর স্থান হ'ল মন্দিরচত্বরে ক্ষেত্রপালরূপে।

শ্রীমন্দিরের বাহিরে পথপার্শ্বে এক পুস্তকাগার। তার পাশ দিয়ে সোপান-শ্রেণী নেমে গিয়েছে, একদিকে তপ্তকুণ্ডে, অপরদিকে অলকানন্দায়। তপ্ত-কুণ্ডের আয়তন ১৬ ফুট দীর্ঘ, ১৪ ফুট প্রশস্ত ও ৪ ফুট গভীর। একধারে এক ক্ষুদ্র গহ্বর থেকে তপ্তজলের প্রবাহ নির্গত হয়ে কুণ্ডটিকে জলপূর্ণ করে রাখছে; অপর পার্শ্বে এক গহ্বর দিয়ে উদ্বৃত্ত জল বহির্গত হয়ে যাচ্ছে। কুণ্ডের উপরে ছাদ আছে। সকলেরই অধিকার আছে ঐ তপ্তকুণ্ডে অবগাহন স্নানে। আমরাও স্নান করলাম। অভাবনীয়, অবর্ণনীয় পরিতৃপ্তি সেই স্নানে। তুষারশীতল উচ্চতায় ঐ তপ্তকুণ্ডের উদ্ভব হয়েছে কার ব্যবস্থায়? যিনি সদ্যোজাত অসহায় শিশুর জন্য মাতৃস্তনে সুধাধারা সঞ্চারিত করেন তিনিই ভক্ত মানুষের, শুধু ভক্ত মানুষের কেন, সর্বজীবের যা কিছু সত্যিকারের প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা যথাসময়ে যথাস্থানে করে রাখেন। সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে স্মরণ করে তাঁরই সাক্ষাৎ প্রতিনিধি জ্ঞানে মন্ত্রপাঠরত পাণ্ডাঠাকুর মহাশয়কে সেই তপ্তকুণ্ডের চত্বরে বসে তৈজসপত্র, ভোজ্যসামগ্রী, বস্ত্র, গীতা ও নারিকেলের ভিতর গোপনে রাখা স্বর্ণ ও রৌপ্য সাধ্যমত দিলাম। সকলেই দেয়। এ নাকি অবশ্য কৃত্য। বাহিরে উন্মুক্ত স্থানে আরও কয়েকটি কুণ্ড আছে।

ঐস্থানের কিছুদূর উত্তরে সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মকপাল। প্রায় গোলাকার কূর্ম-পৃষ্ঠবৎ এক সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড। সেখানে পিতৃপুরুষের মুক্তি কামনায় পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে। সেখানে ঐ কার্যের জন্য পৃথক পুরোহিত আছেন। মিশ্রিত হিন্দী ও সংস্কৃত মন্ত্রপাঠ করিয়ে ঐ পুরোহিত এক এক দলে দশ-বারজন লোককে তাঁদের পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করাচ্ছেন দেখলাম। শ্রীমন্দিরের বাহিরে পথের ধারে একস্থানে ঐ পিণ্ডদানের জন্য শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণের অন্নভোগ. নূতন বস্ত্রখণ্ড, হরিদ্রা, চন্দন, তিল প্রভৃতি আনুষঙ্গিক উপাদান বিক্রয় হয়। সওয়া পাঁচ আনা থেকে বিভিন্ন মূল্যে। প্রবাদ আছে যে পরলোকগত আত্মা মুক্তি কামনায় এখানে সূক্ষ্ম-শরীরে প্রতীক্ষা করে থাকেন। বংশের কেহ এসে এই ব্রহ্মকপালে তাঁদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করে তাঁদের মুক্তি প্রার্থনা করলে সেই সব প্রতীক্ষারত আত্মা পিতৃলোক থেকে দেবলোকে গমন করেন। মুক্তি-লাভ করেন। ঐখানে পিণ্ডদানের পর আর তাঁদের উদ্দেশে পিণ্ডদান বা তর্পণের নাকি প্রয়োজন থাকে না। দেখলাম সেখানে এক ভাবময় পরিবেশ। যথাকর্তব্য সম্পন্ন করলাম সেখানে বসে। পরলোকগত পিতৃকুল, মাতৃকুল, আত্মীয়স্বজন, বান্ধব, অবান্ধব সকলের উদ্দেশে পরম শ্রদ্ধায় পিণ্ডদান করলাম। একুশ ভাগে বিভক্ত ছোট ছোট পিণ্ড পূর্বেই প্রস্তুত করা হয়েছিল। পিণ্ডদানের দক্ষিণার সঙ্গে পৃথক হিসাবে গো-দান, ভূমিদান প্রভৃতির মূল্য পুরোহিত মহাশয় গ্রহণ করেন। খুব বেশী নয়। সর্বনিম্ন পাঁচ টাকা। এঁদের তো এই জীবিকা। সর্ব-স্রষ্টা এবং সর্বস্ব-গ্রাস-কর্তা বিশ্বম্ভর বিশ্বরূপ এঁদের মধ্যেও তো প্রকাশমান। কন্যা অঞ্জলি তার অকালে লোকান্তরিত স্বামী পশুপতির উদ্দেশে পিণ্ডদান করলো; আমার পাশে বসে। অতীত দিন মনে পড়ায় চোখ ঝাপসা হয়ে গেল চোখের জলে। মনে পড়ছিল একান্ত স্নেহপরায়ণ পিতৃদেবের কথা, পরম নিষ্ঠাবান দীর্ঘদেহ পিতামহের কথা। হঠাৎ মনে হ'ল যেন তাঁরা সব আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রসন্ন বদনে আশীর্বাদ করছেন। পরিতৃপ্ত হ'ল মন। সার্থক মনে হ'ল দুর্গম পথের তীর্থযাত্রা।

পবিত্র বদরীনাথধামে তিন দিন অবস্থানের পর ২৬শে মে স্নানাহার করে শুরু হ'ল আমাদের প্রত্যাবর্তন। স্বর্গরাজ্য থেকে মর্ত্যধামে পুনরাগমন। আবার ফিরে যেতে হবে ধূলির ধরণীতে, দ্বন্দ্ব-মুখর স্বার্থ-কলুষিত পঙ্ক-মলিন আবর্তের ভিতর। কলিযুগে মানুষের জন্য বুঝি আছে আমরণ গার্হস্থ্য। সংসারের চিরন্তন দাসত্ব। পুরাকালে এইখানে ছিল মহাপ্রস্থানের পথ।

এখানে এসে কেউ আর ফিরে যেত না। এখন সকলেই ফিরে যায়। তবে আচার্য শঙ্করের বিধান অনুযায়ী তীর্থগুরু পাণ্ডার কাছ থেকে 'সুফল' ও আশীর্বাদ নিয়ে। আমরাও ফিরে চলেছি। দেহ ফিরে চলেছে। মন ফিরতে নারাজ। কোথা থেকে কোথায় নেমে চলেছি? কোথায় ফিরছি?

দেবতাত্মা হিমালয়ে গত কয়েকদিনে কিছু কিছু দেখলাম বৈকি। দেখলাম উত্তুঙ্গ পর্বত শিখর থেকে নেমে আসা তুষার-গলা প্রবল জলধারা; জমাট বরফের আচ্ছাদন ভেদ করে তীব্রবেগে ধাবমানা স্রোতস্বিনী; পর্বতগাত্রে গগন-চুম্বি মহীরুহ। শুনলাম স্বচ্ছ-সলিলা নীলাভ তটিনীর ঊর্মি-মুখর কল-ঝঙ্কার। অনুভব করলাম নিবিড় অরণ্যের শিহরণ-সঞ্চারী শৈত্য; কত নাম-না জানা ফুলের অপরূপ শোভা সন্দর্শন করলাম; সর্বোপরি অন্তরে গ্রহণ করলাম স্নিগ্ধ-শীতল পার্বত্য সমীরণের আনন্দপ্রদ প্রভাব। তথাপি মনে হ'তে লাগলো, অনেক কিছুই তো দেখা হ'ল না, জানা হ'ল না। অনেক অনুভূতি অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। দেখা হ'ল না শতোপন্থ। মাত্র পনেরো মাইল উত্তরে অবস্থিত, সমুদ্রতট থেকে ১৪,৪০০ ফিট উচ্চে। দেখা হ'ল না স্বর্গারোহণী; আরও ছয় মাইল উত্তরে। তার উচ্চতা ১৮,৮০০ ফিট। স্বর্গ আরোহণের সোপান। দেখা হ'ল না অলকাপুরী, যেখান থেকে হয়েছে অলকানন্দার উদ্ভব। বদরীনাথধাম থেকে মাত্র সাত মাইল উত্তরে। দেখা হ'ল না ব্যাস-গুহা, যেখানে বসে ব্যাসদেব রচনা করেছিলেন মহাভারত আর শ্রীমদ্‌ভাগবত। সেসব অনেক কিছু দেখা হ'ল না। আর হবেও না। তা না হোক্। যা দেখেছি যা পেয়েছি, কবির ভাষা উদ্ধৃত করে বলতে পারা যায়, তুলনা তার' নেই। উপলব্ধির, অনুভূতির আনন্দপ্রদ সঞ্চয়ে অন্তর অভিভূত। ভাব-সম্পদেই তো দেবতার অধিষ্ঠান।

"ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো ন শিলায়াং কদাচন
ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্ ভাবং সমাশ্রয়েৎ।
ন দেব পর্বতাগ্রেষু ন দেব শিব-সদ্মনি
দেবশ্চিদানন্দময়োহৃদিভাবেন দৃশ্যতে॥"

কাষ্ঠনির্মিত বা প্রস্তরনির্মিত মূর্তিতে কি দেবতা বিদ্যমান? দেবতা কি আছেন পাহাড়ের চূড়ায়? না, তা তো নয়। দেবতা আছেন সর্বত্র, আছেন সকলের হৃদয়ে। "হৃদি সর্বস্য বিষ্টিতং।" তাঁকে উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন একাগ্র মনোভাব। ভাবের দর্পণেই তিনি প্রতিভাত হন। একাগ্রতা অর্জনের জন্য

চাই তপস্যা। কলিযুগে অন্নগত-প্রাণ ক্ষীণ-আয়ু মানুষের পক্ষে তীর্থযাত্রাই তপস্যা। দুর্গমতীর্থ স্বতঃই ধীরে ধীরে মনকে ঈশ্বরাভিমুখে আকর্ষণ করে।

॥ প্রত্যাবর্তন ॥

ফিরবার পথে ২৭শে মে পাণ্ডুকেশ্বর থেকে আমরা এলাম যোশীমঠে। ডাণ্ডীবাহকদের ও ভারবাহী কুলীদের এইখান থেকে বিদায় দেওয়া হ'ল। এদের ঋণ অপরিশোধ্য। নির্ধারিত পারিশ্রমিক মিটিয়ে দিলেন ম্যানেজার বাদলচন্দ্র, আমাদের গচ্ছিতরাখা টাকা থেকে। কন্যা অঞ্জলি কলকাতা থেকে এনেছিল আমার জন্য দুটি টিনের কৌটায় ভর্তি করা রসগোল্লা। নষ্ট হয় না। পথে খোলা হয়নি। দরকারও হয়নি। সেই টিনের কৌটা এখানে কেটে রসগোল্লা কতকগুলি ডাণ্ডীবাহকদের বিতরণ করে দিল। দেওয়া হ'ল তাদের মাফলার, জলের ফ্লাস্ক, গরম জামা প্রভৃতি যে যা চাইলো। বর্ষাতি কোটও। তাদের সরল মনের আনন্দোচ্ছ্বাস দেখে আমাদেরও মন আনন্দে পরিপূর্ণ হ'ল।

হরিদ্বার থেকে বদরীনাথধামের দূরত্ব ১৯২ মাইল। কেদারধামের-দূরত্ব ১২৯ মাইল। পূর্বেই বলেছি রুদ্রপ্রয়াগ থেকে দুটি বিভিন্ন পথে ঐ দুই ধামে যেতে হয়। কেদারধামের উচ্চতা ১১,৭৫০ ফিট, বদরীনাথধামের উচ্চতা ১০,২৪৪ ফিট। কেদারের তুলনায় বদরীনাথধামে শৈত্যবোধও কম। কেদার থেকে বদরীনাথধামের দূরত্ব, রুদ্রপ্রয়াগ দিয়ে ঘুরে যেতে ১০১ মাইল।

শাস্ত্রমতে বদরীক্ষেত্র কণ্বমুনির আশ্রম নন্দপ্রয়াগ থেকে আরম্ভ করে মহর্ষি বেদব্যাসের আবাসভূমি কেশবপ্রয়াগ পর্যন্ত বিস্তৃত। স্থানের প্রভাব অনুযায়ী এই ক্ষেত্র চার ভাগে বিভক্ত। স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম। নন্দপ্রয়াগ থেকে গরুড়-গঙ্গা পর্যন্ত একুশ মাইল স্থূল; সেখান থেকে বিষ্ণুপ্রয়াগ সতেরো মাইল সূক্ষ্ম; তারপর কুবেরশিলা পর্যন্ত ষোল মাইল সূক্ষ্মতর; এবং কুবেরশিলা থেকে কেশব প্রয়াগ পর্যন্ত দুই মাইল সূক্ষ্মতম। ঐ সকল বিভিন্ন ভূমিতে তপস্যার ফলে প্রাপ্ত হওয়া যায় যথাক্রমে সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য। পাণ্ডুকেশ্বর থেকে আরম্ভ হয় স্বর্গদ্বার; হনুমানচটি থেকে মুক্তিদ্বার। বদরীনাথধাম থেকে একখানি পুস্তক কিনে নিয়েছিলাম। তাতে এইসব বৃত্তান্ত পড়লাম যোশীমঠে এসে।

২৮শে মে প্রত্যুষে দুখানি সংরক্ষিত মোটর বাসে আমরা যোশীমঠ থেকে প্রত্যাবৃত্ত হলাম। ৯১ মাইল পথ অতিক্রম করে দিনের শেষে গাড়োয়াল রাজ্যের প্রাক্তন রাজধানী 'শ্রীনগরে' পৌঁছে সেখানে রাত্রিবাস করতে হ'ল। ২৯শে মে সেই 'বাস্' দুখানিই আমাদের পৌঁছে দিল ঋষিকেশ রেল স্টেশনে। তখন সকাল সাড়ে দশটা।* তারপর তিন দিন হরিদ্বারে অবস্থান করে যথাসময়ে ২রা জুন সকালে হাওড়া স্টেশন এবং সেখান থেকে সন্ধ্যায় ফিরে এলাম সস্ত্রীক মেদিনীপুরে—আমার কর্মক্ষেত্রে ও সাংসারিক বাসস্থানে। কন্যা হাওড়া স্টেশন থেকে গেল তার শ্বশুরালয়ে খিদিরপুরে।

শেষ হ'ল পথের কথা। শেষ হ'ল পথের পরিচয়। কিন্তু তার সঙ্গে শেষ হবে কি এই তীর্থযাত্রায় সঞ্চিত মানসিক অনুভূতি? না, তা হবে না। সেই অনুভূতিই তো তীর্থের সুফল। চোখের সামনে স্বপ্নে ও জাগরণে ভাসতে থাকবে মন্দাকিনী ও অলকানন্দার প্রবাহ, জেগে থাকবে তুষারমৌলী হিমালয়ের উত্তুঙ্গ মহিমা; কানে শুনতে থাকব গভীর পার্বত্য অরণ্যে নাম-না-জানা বিহগের কল-কাকলী, প্রবহমাণ কালের নিঃশব্দ সঙ্গীত, বন্ধনমুক্ত নির্ঝরের ব্যাকুল ঝঙ্কার। সব মিলিয়ে এবং সব কিছুর উপরে মনকে অপার্থিব আনন্দে অভিভূত করে রাখবে শ্রীশ্রীকেদারনাথ ও শ্রীশ্রীবদরীবিশালের অবর্ণনীয় প্রভাব।